Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সীরাহ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাত জাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০০২৮


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাত জাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০০২৮

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সীরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাত জাহান, আইডিঃ ২৩১০০১২০০২৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সীরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Jannat Jahan

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**জান্নাত জাহান**

আইডিঃ ২৩১০০১২০০২৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকা ..... 7

সিরাহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ..... 8

পূর্ব পুরুষ ..... 8

জন্ম ..... 9

শৈশব ..... 9

কৈশোর ..... 10

যৌবন ..... 11

নবী পরিবার ..... 12

কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ ..... 12

নবুআত প্রাপ্তি ..... 14

দাওয়াতি জীবন ..... 17

অত্যাচার ভোগ ..... 19

হাবশায় হিজরত ..... 33

আপোষহীন ..... 38

দুই শক্তিশালীর ইসলাম গ্রহণ ..... 43

বয়কট ..... 47

আবু ত্বালিব ও খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু ..... 50

তায়েফ সফর ও বহিরাগতদের ইসলাম গ্রহণ ..... 53

আক্বাবার বায়'আত ..... 62

ঈসরা ও মিরাজ ..... 65

ইয়াসরীবে হিজরত ..... 71

মদিনার সামাজিক অবস্থা ..... 85

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা .....90
ইসলামে জিহাদ বিধান .....99
অভিযান ও যুদ্ধসমূহ .....105
ক্বিবলা পরিবর্তন.....109
বদর যুদ্ধ .....110
মদিনার সনদ :.....128
ওহুদ যুদ্ধ .....131
ওহুদ পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ .....135
হুদাইবিয়ার সন্ধি .....142
বাদশাহাদের নিকট পত্র প্রেরণ .....151
খায়বার যুদ্ধ .....154
খাইবার পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ.....157
ক্বযা ওমরাহ .....158
ক্বযা ওমরাহ পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ .....161
মুতার যুদ্ধ .....163
মুতা পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ .....166
মক্কা বিজয় .....167
হোনায়েনের যুদ্ধ .....170
হোনায়েন পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ.....176
তাবূক যুদ্ধ .....180
তাবুক পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ.....185
ইহূদী চক্রান্ত সমূহ.....187
প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন.....191
রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ.....194

বিদায় হজ্জ .....197
অসুখের সূচনা .....199
সর্বশেষ ইমামতি .....203
জীবনের শেষ দিন .....205

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দরবারে । যিনি আমাকে দয়া করে সৃষ্টি করেছেন। আমার মতো গোনাহগার বান্দি কে সুযোগ করে দিয়েছেন সীরাহ নিয়ে কিছু লিখার জন্য। আমার জ্ঞান খুবই কম এবিষয়ে। কারণ জাগতিক বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গাফেল থেকেছি।সীরাহ নিয়ে ৫মিনিট বসে কখনো ভাবা হয়নি। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কে নিয়ে ভাবনা ও গবেষণা করার তৌফিক দান করেছেন আমার রব। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে সীরাহতে। কিন্তু আমরা সেই সীরাহ থেকেই দূরে থাকি। পবিত্র কুরআন এ আল্লহ পাক রব্বুল আলামীন বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি ও শেষ দিবসকে কামনা করে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে।"(সূরা আহযাব ৩৩/২১)। আমরা জাগতিক সুবিধা লাভের আশায় এই সীরাতকে আমরা দূরে সরিয়ে অন্যান্য বিষয় কে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। দুনিয়ার ছলনায় আমরা রব্বে কারীমের সতর্ক বার্তা ভুলে যাই। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়টি সুন্নাহ আমি জানি আর কয়টায় বা আমি মানি, এবিষয়ে কখনো তালিকা করিনি। অপরদিকে দুনিয়ার কোন কোন সম্পদ আমার আয়ত্তে আছে তার তালিকা করি নিশি দিন। আমার সন্তানের কল্যাণ কামনায় উদগ্রীব থাকি আমি। কিন্তু রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করে যাওয়া ওছিয়ত আমাকে ভাবিয়ে তুলে না।তাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া যে তিনি আমাকে দয়া করে সীরাহ বড়সম্পর্কে ভাবতে, পড়তে ও দুকলম লেখার তৌফিক দান করেছেন। যে সম্মানিত ব্যক্তিগণ আমার এ চেষ্টা টুকু পড়বেন তাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া আপনারাও আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা দীনের উপর অটল থাকি।

# সিরাহ শাস্ত্রের উৎপত্তি

সিরাহ শব্দটি একটি আরবী শব্দ।যার অর্থ হচ্ছে পথ। এখানে সিরাহ বলতে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শকে বুঝানো হয়েছে। মানুষ যেমন সঠিক পথে চললে তার কাংখিত স্থানে পৌঁছে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শকে ধারণ করে চললে জান্নাতে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ।আমরা এখানে তুলে ধরবো সিরাহ শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ।আরবরা ছিলেন প্রখর মেধা শক্তি সম্পন্ন। সবকিছু তারা সাবলীল ভাবে মুখস্থ বলতে পারতেন।লেখাকে তারা অতোটা গুরুত্ব দিতেন না। সেকারণে রসূলের(ছা:)ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পবিত্র কুরআন, কিছু হাদিস ও ঈলমে মূলনীতি সমূহ ব্যতীত কোন জীবন চরিত লিপিবদ্ধ হয়নি। পরবর্তী সময়ে অনারবদের অধিকহারে ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপটে মুআবিয়া(রা) এর খেলাফত কালে (৪১-৬০হি/৬৬১-৬৮০খৃ) এ বিষয়ের সূচনা হয়। তিনি ইয়ামনের ছানআ থেকে আবীদ বিন শারিইয়াহ জুরহুমীকে ডেকে এনে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেন। আবীদ বিন শারিইয়াহ জুরহুমী মুআবিয়া (রা)এর জন্য বাদশাহদের ওবিগতদের ইতিহাস) রচনা করেন।অত:পর একাধিক বিদ্বান রাসূলুল্লাহ (ছা) এর জীবনী লেখার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

# পূর্ব পুরুষ

হযরত ইবরাহীম ( আ)এর দুই পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ)ও হযরত ইসহাক (আ)। হযরত ইসমাইল (আ)এর মা ছিলেন বিবি হাজেরা। এবং হযরত ইসহাক (আ) এর মা ছিলেন বিবি সারাহ। দুই পুত্র,ই নবী হয়েছিলেন। ছোট ছেলে ইসহাক (আ) এর  বংশে অসংখ্য নবী ও রাসূল এসেছেন। কিন্তু বড় ছেলে ইসমাইল (আ) এর বংশে যুগের পর যুগ কোন নবী -রাসূল আসেন নি।এই বংশে মাত্র একজন নবীর জন্ম হয়।তিনিই হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইবরাহীম (আ) মহান আল্লাহর নির্দেশে  দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা ও তার শিশু

পুত্র ইসমাইল (আ)কে মক্কার রেখে আসেন। এবং মাঝে মধ্যে তাদের সাথে দেখা করে আসতেন। অন্যদিকে ইবরাহীম ( আ) এর প্রথম স্ত্রী সারা ও পুত্র ইসহাক , অন্যান্যদের নিয়ে কেনআন (ফিলিস্তিনি) এ বসবাস করতেন। এখানেই হযরত ইবরাহিম (আ)এর মৃত্যু হয়।

## জন্ম

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম হস্তী বর্ষের ৯ই রবীউল আওয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ্ এবং মায়ের নাম ছিলো আমেনা। দাদার নাম ছিলো আব্দুল মুত্তালিব এবং দাদির নাম ছিলো ফাতিমা। নানার নাম ছিলো ওয়াহাব এবং নানীর নাম ছিলো বাররাহ। জন্মের পূর্বেই  তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতৃহীন নবজাতক কে কোলে নিয়ে সেন্থশীল দাদা কাবা গৃহে প্রবেশ করেন।প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিনে নবজাতকের খৎনা ও নামকরণ করা হয়।

## শৈশব

জন্মের পর শিশু মুহাম্মদ ( সসব কিছু দিন আবু লাহাব এর শাস্তি সুওয়াইবার দুধ পান করেন। পিতা আব্দুল্লাহর রেখে যাওয়া একমাত্র মুক্ত দাবি উম্মে আয়মন রাসুল (সব) কে  শৈশব এ লালন পালন করেন । এরপর ধাত্রী হালিমা সাদিয়া তাকে প্রতিপালন করেন । হালিমার কাছে অবস্থান করার সময়  তার বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে । হালিমার গৃহ থেকে আসার পর মা আমেনা তাকে মদীনায় স্বামীর কবরে জিয়ারত করতে যান । ফেরার পথে মা আমেনা মৃত্যু বরণ করেন।অ। অত: পর শিশু মুহাম্মদ (স) কে সাথে নিয়ে কিশোরী উম্মে আয়মন মক্কায় ফেরেন ।  পরম মমতাময়ী মায়ের মৃত্যুর  পর লালন পালন করেন তার দাদা । দাদার স্নেহ নীড়ে দুই বছর থাকেন ।

দুই বছর পর দাদা মারা যান। । দাদার মৃত্যুর পর লালন পালন করেন আবু তালেব । আবু তালেব ছিলেন তার আপন চাচা।

## কৈশোর

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ও চাচি খুব ভালো ছিলেন । তারা তাকে পরম মমতায় প্রতিপালন করেন । সন্তানসম ভালোবাসার চাদরে আগলে রাখেন আমাদের প্রিয় নবী (স) কে । আমাদের নবীজি (সা) ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মক্কার পথে প্রান্তরে মেষ চড়িয়েছেন । চাচার সংসারে বোঝা হয়ে থাকেন নি । চাচার সাথে ব্যবসার কাজে সাহায্য করেছেন । একবার চাচার সাথে ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় গমন করেন । পথিমধ্যে বাহিরা নামক এক পাদ্রীর সাথে দেখা হয় । পাদ্রী দেখা মাত্রই রহমাতুল্লিল আলামিন কে চিনে ফেলেন । কারণ তারা শেষ নবী (স) সম্পর্কে এমন ভাবে জানে যেমন তারা তাদের সন্তান সম্পর্কে জানে । কারণ আসমানী কিতাব এ শেষ নবী (স) সম্পর্কে অনেক ধরনের তথ্য ছিল । বাহিরা আবু তালেব কে বলেন দ্রুত নবী (স) কে ফিরে যেতে । কারণ ইয়াহুদিরা জানলে তাকে (স) কে হত্যা করে ফেলবে । এবিষয়ে জানার পর আবু তালেব কিছু বিশ্বস্ত কৃতদাসের সাথে আমাদের প্রিয় নবী (স) কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন । নবীজি (স) কিশোর বয়সে খুব ভয়াবহ এক যুদ্ধের সম্মুখীন হন । যে যুদ্ধ হারবুল ফিজার নামে পরিচিত । এ যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন নি । তবে তিনি চাচাদের জন্য তীর সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন । যুদ্ধের ভয়বহতায় তার কিশোর হৃদয় কেঁপে উঠলো । এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল টানা দশ বছর ।

# যৌবন

যুদ্ধ চলমান এক পরিবেশে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেন । যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর প্রাণহানি তার হৃদয়কে বিগলিত করে দেয় । তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন । তিনি সমমনা ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত করেন হিলফুল ফুযুল নামক একটি সংগঠন । এ সংগঠনের কাজ ছিল মক্কায় যাবতীয় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। মক্কায় আগত বহিরাগতদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা । তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের সঠিক হিস্যা বুঝিয়ে দেয়া। মক্কার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কথা। সবাই তাকে আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করলেন।বিবি খাদিজা ও মুগ্ধ হলেন বিশ্ব নবীর চরিত্রের মাধুর্য্যে। বিবি খাদিজা ছিলেন তৎকালীন সময়ে ধনী মহিলা তিনি বিধবা ছিলেন । তার দুই বার বিয়ে হয়েছিল । তিনি আবু তালেব এর কাছে অনুরোধ করেন বিশ্বনবিকে ব্যবসার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। চাচার অনুরোধে তিনি খাদিজার ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় গমন করেন। সিরিয়ায় গমন কালে তার সাথে ছিল খাদিজার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মায়সারা।ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয় । ব্যবসায়িক আমানতদারি ও উত্তম চরিত্রের মাধুর্য্যে বিবি খাদিজা মুগ্ধ হয়ে নবীজি (সা) কে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন । প্রিয় বান্ধবী কে দিয়ে পাঠান বিয়ের প্রস্তাব । দুই পরিবারের অভিভাবকদের সম্মতিতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ধুমধাম করে বিয়ে হয় । নবীজি **(সা:)** বিশটি উট মোহরানা হিসেবে দেন । হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আম্মাজান খাদিজা **(রা)** তৃতীয় স্বামী ।অপর দিকে নবী **(স;)** এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন আম্মাজান খাদিজা **(রা)** । তিনি জীবিত থাকতে নবী **(স;)** কখনো দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি । আম্মাজান খাদিজা **(রা) স্বামীর প্রতি খুব ই অনুগত ছিলেন । তিনি কখনো আমাদের প্রিয় নবী (স) কে কষ্ট দেননি । তিনি তার সমস্ত সম্পদ প্রিয় নবী ( স) কে দিয়ে দেন । আম্মাজান খাদিজা (রা) এর গর্ভে ছয়টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় । চার জন কন্যা ও দুই জন পুত্র । পুত্র দুই জন শিশু কালে মৃত্যু বরণ করেন।**

# নবী পরিবার

নবী পরিবার বলতে নবীর স্ত্রী গণ ,আলী, ফাতেমা , হাসান ও হোসেনকে বুঝানো হয় ।(মুসলিম হা/২৪২৪)। আল্লাহ বলেন , "হে নবী পরিবারের সদস্যগণ ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত -পবিত্র রাখতে।"(সূরা আহযাব ৩৩/৩৩)। তবে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে "আহলে বায়েত" বলতে তাদের কে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর চিরদিন ছদাকা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ । তারা হলেন আলী,আক্বীল, জাফর ও আব্বাস (রা) এর বংশধর । (মুসলিম হা/২৪০৮, আলীর মর্যাদা অনুচ্ছেদ)।

বিভিন্ন সময়ে রাসূল (সা) এর মোট এগারো জন স্ত্রী ছিলেন । তন্মধ্যে হযরত খাদিজা ( রা) ও যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা) প্রিয় নবী ( স) এর জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করেন । বাকি ৯ জন স্ত্রী রেখে তিনি (সা) মারা যান । তারা হলেন যথাক্রমে হযরত সাওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা ), হযরত হাফসা (রা) , হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ,হযরত যয়নব বিনতে জাহশ( রা) হযরত জুওয়াইরিয়াহ (রা) হযরত উম্মে হাবিবা (রা) হযরত সাফিইয়াহ (রা) ও হযরত মায়মুনা বিনতুল হারেছ (রা) । এছাড়াও তার দুই জন দাসি ছিল। একজন খ্রিস্টান কন্যা মারিয়া ক্বিবত্বিয়াহ । তার গর্ভে পুত্র ইব্রাহিম জন্ম লাভ করেন । যাকে মিসরের রাজা মুক্বাউক্বিস হাদিয়া স্বরুপ পাঠিয়েছিলেন ।অন্যজন ইহূদি কন্যা রায়হানা বিনতে যায়েদ আল-কুরাযিয়াহ।

# কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ

আল-আমীন মুহাম্মাদ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরায়েশ নেতাগণ কা'বাগৃহ ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে গড়া ন্যূনাধিক আড়াই হাযার বছরের স্মৃতিধন্য এই মহা পবিত্র গৃহ সংস্কারের ও পুনর্নির্মাণের পবিত্র কাজে সকলে অংশীদার হ'তে চায়।

ইবরাহীমী যুগ থেকেই কা'বাগৃহ ৯ হাত উঁচু চার দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর ছিল, যার কোন ছাদ ছিল না। কা'বা অর্থই হ'ল চতুর্দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর। চার পাশের উঁচু পাহাড় থেকে

নামা বৃষ্টির স্রোতের আঘাতে কা'বার দেওয়াল ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া সে বছরের তীব্র বন্যায় কা'বা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। অধিকন্তু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঐ সময় ঘটে যায়, যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি এবং যা কা'বা পুনর্নির্মাণে প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। ঘটনাটি ছিল এই যে, কিছু চোর দেওয়াল টপকে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং সেখানে রক্ষিত মূল্যবান মালামাল ও অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়।

কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে স্থির করেন যে, এর নির্মাণ কাজে কারু কোনরূপ হারাম মাল ব্যয় করা হবে না। অতঃপর কোন কোন গোত্র মিলে কোন পাশের দেওয়াল নির্মাণ করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে এবার ছাদ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যা ইতিপূর্বে ছিল না। কিন্তু কে আগে দেওয়াল ভাঙ্গার সূচনা করবে? অবশেষে অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সাহস করে প্রথম ভাঙ্গা শুরু করেন। তারপর সকলে মিলে দেওয়াল ভাঙ্গা শেষ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্থাপিত ভিত পর্যন্ত গিয়ে ভাঙ্গা বন্ধ করে দেন।

অতঃপর সেখান থেকে নতুনভাবে সর্বোত্তম পাথর দিয়ে ‘বাকূম’ নামক জনৈক রোমক কারিগরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকার্য শুরু হয়। কিন্তু গোল বাঁধে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'হাজারে আসওয়াদ' স্থাপনের পবিত্র দায়িত্ব কোন গোত্র পালন করবে সেটা নিয়ে। এই বিবাদ অবশেষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গড়াবার আশংকা দেখা দিল। তখন প্রবীণ নেতা আবু উমাইয়া মাখযূমী প্রস্তাব করলেন যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম 'হারামে' প্রবেশ করবেন, তিনিই এই সমস্যার সমাধান করবেন। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিল।

আল্লাহর অপার মহিমা। দেখা গেল যে, বনু শায়বাহ ফটক দিয়ে সকালে সবার আগে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন সকলের প্রিয় 'আল-আমীন'। সবই তাকে দেখে বলে উঠলো ,’এই যে আল-আমীন। আমরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এই যে মুহাম্মাদ'। অতঃপর তিনি ঘটনা শুনে একটা চাদর চাইলেন এবং সেটা বিছিয়ে নিজ হাতে 'হাজারে আসওয়াদ' উঠিয়ে তার মাঝখানে রেখে দিলেন। অতঃপর নেতাদের বললেন, আপনারা সকলে মিলে চাদরের চারপাশ ধরে নিয়ে চলুন। তাই করা হ'ল। কা'বার নিকটে গেলে তিনি পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন।এই দ্রুত ও সহজ সমাধানে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মাদের তারীফ করতে করতে চলে গেল। আরবরা এমন এক যুদ্ধ থেকে বেঁচে

গেল, যা ২০ বছরেও শেষ হ'ত কি-না সন্দেহ। এ ঘটনায় সমগ্র আরবে তাঁর প্রতি ব্যাপক শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠলো। নেতাদের মধ্যে তাঁর প্রতি একটা স্বতন্ত্র সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হ'ল।

উল্লেখ্য যে, নবুঅত লাভের পূর্ব পর্যন্ত কুরায়েশগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শ্রদ্ধাভরে আল-আমীন বলেই ডাকত

কা'বাগৃহ নির্মাণের এক পর্যায়ে উত্তরাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনু 'আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই তাদের হালাল অর্থের কমতি থাকায় কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মূল ভিতের ঐ অংশের প্রায় সাত হাত জায়গা বাদ রেখেই দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। যা হাতীম  বা পরিত্যক্ত নামে আজও ঐভাবে আছে। সেকারণ হাতীমের বাহির দিয়েই ত্বাওয়াফ করতে হয়, ভিতর দিয়ে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পরে ঐ অংশটুকু কা'বার মধ্যে শামিল করে মূল ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বা পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নওমুসলিম কুরায়েশরা সেটা মেনে নিবে না ভেবে বিরত থাকেন' )বুখারী হা/১৫৮৬)। একারণেই বলা হয়ে থাকে "'মন্দ প্রতিরোেধ অধিক উত্তম কল্যাণ আহরণের চাইতে'। উল্লেখ্য যে, হিজরতের ১৮ বছর পূর্বে কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত হয়'

## নবুআত প্রাপ্তি

নবুঅত লাভের সময়কাল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। এক সময় তিনি কা'বাগৃহ থেকে প্রায় ৬ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে হেরা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছোট গুহার নিরিবিলি স্থানকে বেছে নিলেন। বাড়ী থেকে তিনি পানি ও ছাতু নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার আসতেন। কিন্তু বাড়ীতে তার মন বসতো না। কখনো কখনো সেখানে একটানা কয়েকদিন কাটাতেন। তাঁর এই ইবাদত কতদিন ছিল, সেটির ধরন কেমন ছিল, সে বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। অতঃপর রবীউল আউয়ালের জন্ম মাস থেকে শুরু হয় ('সত্যস্বপ্ন') দেখা। তিনি স্বপ্নে যাই-ই দেখতেন তাই-ই দিবালোকের ন্যায় সত্য হয়ে দেখা দিত' । এভাবে চলল প্রায় ছয়

মাস। যা ছিল ২৩ বছরের নবুঅতকালের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। হাদীছে এজন্যই সম্ভবত সত্য স্বপ্নকে নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে।

কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বগোত্রীয় লোকদের পৌত্তলিক ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা তাকে এসে গেল রামাযান মাস। পূবের ন্যায় এবারেও তিনি পুরা রামাযান সেখানে ই'তিকাফে পাগল করে তুলত। কিন্তু তাদের ফিরানোর কোন পথ তাঁর জানা ছিল না।

২১শে রামাযান সোমবার ক্বদরের রাত্রি।" ফেরেশতা জিবরীলের আগমন হ'ল।

ধ্যানমগ্ন মুহাম্মাদকে বললেন, إِقْرَأْ 'পড়'। বললেন, مَا أَنَا بِقَارِئٍ 'আমি পড়তে জানিনা'। অতঃপর তাকে বুকে চেপে ধরলেন ও বললেন, পড়। কিন্তু একই জবাব, 'পড়তে জানিনা'। এভাবে তৃতীয়বারের চাপ শেষে তিনি পড়তে শুরু করলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ

بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - (العلق(١-٥)

(১) 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' (২) 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে' (৩) 'পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু' (৪) 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন' (৫) 'তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না' (আলাক্ব ৯৬/১-৫)।

এটাই হ'ল পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর প্রথম প্রত্যাদেশ। হে মানুষ! তুমি পড় এবং লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন কর। যা তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয় এবং তাঁর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী তোমার জীবন পরিচালনার পথ বাৎলে দেয়। কুরআনের অত্র আয়াতগুলি প্রথম নাযিল হ'লেও সংকলনের পরম্পরা অনুযায়ী তা ৯৬তম সূরার প্রথমে আনা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই তারতীব আল্লাহ্র

হুকুমে হয়েছে, যা অপরিবর্তনীয়। এর মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।
মাত্র পাঁচটি আয়াত নাযিল হ'ল।

নতুন অভিজ্ঞতায় শিহরিত মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্রুত বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, “শিগগীর আমাকে চাদর মুড়ি দাও। চাদর মুড়ি দাও”। কিছুক্ষণ পর কেবল স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর নির্ভরতার প্রতীক ও সান্ত্বনার স্থল। ছিলেন ভয়ার্তভাব কেটে গেলে সব কথা স্ত্রীকে খুলে বললেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে খাদীজা বিপদের বন্ধু। তিনি অভয় দিয়ে বলে উঠলেন, “এটা খারাপ কিছুই হ'তে পারে না। 'কখনোই না।“ আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আতীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন'।” বস্তুতঃ সে যুগে কেউ কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলে তার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রশংসাসূচক বাক্য বলা হ'ত।

অতঃপর খাদীজা স্বামীকে সাথে নিয়ে চাচাতো ভাই অরাক্কা বিন নওফালের কাছে গেলেন। যিনি ইনজীল কিতাবের পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সময় বার্ধক্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব কথা
শুনে বললেন এ তো সেই ফেরেশতা যাকে আল্লাহ মূসার প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়! যদি আমি সেদিন তরুণ থাকতাম। হায়! যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে'। একথা শুনে চমকে উঠে রাসূলুল্লাহ **(ছাঃ)** বললেন, 'ওরা কি আমাকে বের করে দিবে'? অরাক্কা বললেন, 'হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, তা নিয়ে ইতিপূর্বে এমন কেউ আগমন করেননি, যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি’।
অতঃপর আরাক্কা  তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘যদি তোমার সেই দিন আমি পাই তবে আমি তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করবো’।

# দাওয়াতি জীবন

নবীদের দাওয়াতকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দু'ভাগে ভাগ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ্যভাবেই নবুঅতের দাবী নিয়ে দাওয়াত শুরু করেন। প্রত্যেক নবীই তার কওমকে বলেছেন, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই'। আমাদের নবীও বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 'মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল..' (আ'রাফ ৭/১৫৮)। তবে এটাই স্বাভাবিক যে, আপনজনদের নিকটেই প্রথমে দাওয়াত দেওয়া হয়। আর এই দাওয়াত স্থান-কাল-পাত্রভেদে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে কখনো সর্বসমক্ষে হয়ে থাকে। আল্লাহ প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দানের আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) তিন বছর গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন' (ইবনু হিশাম ১/২৬২)।

যেকোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করতে গেলে প্রথমে তা গোপনেই শুরু করতে হয়। পুরা সমাজ যেখানে ভোগবাদিতায় ডুবে আছে, সেখানে ভোগলিপ্সাহীন আখেরাতভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হওয়া সাগরের স্রোত পরিবর্তনের ন্যায় কঠিন কাজ। এ পথের দিশা দেওয়া এবং এ পথে মানুষকে ফিরিয়ে আনা দু'টিই কঠিন বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেকাজের জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন। অহী প্রাপ্ত হওয়ার পরেই খাদীজার সাথে তিনি সে সময়ে মক্কার বয়োবৃদ্ধ সেরা বিদ্বান অরাক্বা বিন নওফাল-এর কাছে যান। তিনি সবকিছু অবগত হওয়ার পর তাঁকে ভবিষ্যৎ বিরোধিতা ও আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেন। ফলে তিনি প্রথমে গোপনে দাওয়াত শুরু করেন। যদিও খাদীজা, আলী, আবুবকর, ওছমান প্রমুখদের মত মক্কার সেরা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ইসলাম কবুলের পর এই দাওয়াত আদৌ গোপন থাকেনি।

প্রথমেই তাঁর দাওয়াত কবুল করেন মহিলাদের মধ্যে তাঁর পুণ্যশীলা স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)। অতঃপর গোলামদের মধ্যে তাঁর মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহ,

শিশু-কিশোরদের মধ্যে আলী ইবনু আবী তালিব এবং বয়স্কদের মধ্যে নিকটতম বন্ধু আবুবকর ইবনু আবী কুহাফাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)।

অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন একে একে ওছমান, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ ও তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)। এছাড়া আবুবকরের স্ত্রী উম্মে রূমান ও মা বারাহ এবং দুই মেয়ে আসমা ও আয়েশা। এছাড়া আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক ৭ জন মুক্তদাস-দাসী হ'লেন, 'আমের বিন ফুহাইরা, উম্মে উবাইস, যিন্নীরাহ, নাহদিয়াহ ও তার মেয়ে এবং বনু মুআম্মাল-এর জনৈকা দাসী এবং বেলাল বিন রাবাহ।
অতঃপর একে একে ইসলাম কবুল করেন আবু ওবায়দাহ ইবনুল জারাহ, আবু সালামাহ, আরকাম, ঊছমান বিন মায'উন ও তাঁর দুই ভাই কুদামাহ ও আব্দুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ বিন হারেছ, সাঈদ বিন যায়েদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিন খাত্ত্বাব (ওমরের বোন), খাব্বাব ইবনুল আরাত, ওমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাছ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবী'আহ আল-ক্বারী, সালীত্ব বিন আমর ও তাঁর ভাই হাতেব বিন আমর, 'আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে সালামাহ, খুনাইস বিন হুযাফাহ, 'আমের বিন রবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ, জা'ফর বিন আবু তালিব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস, নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ ও তাঁর স্ত্রী উমাইনাহ বিনতে খালাফ, হাতেব বিন আমর, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা, ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন বুকায়ের ও তার ভাইগণ 'আমের, 'আক্বিল ও ইয়াস, 'আম্মার, পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়া, ডুহায়েব রূমী, আমর বিন আবাসাহ, মিকুদাদ ইবনুল আসওয়াদ, 'আফীফ বিন কায়েস।

খাদীজা (রাঃ)-এর পরে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও তাঁর গোলাম আবু রাফে' ইসলাম কবুল করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে প্রথম তিন বছরে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা ইসলাম প্রকাশ্য হয়ে পড়ে ও তা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে।

# অত্যাচার ভোগ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিক থেকে লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা বিদ্রুপ করে বলে, আমরাও এরূপ বলতে পারি। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ 'যখন তাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। এসব তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ভিন্ন কিছুই নয়' (আনফাল ৮/৩১)।

উক্ত আয়াতে কাফেররা 'কুরআনকে পুরাকালের কাহিনী এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি' বলে দম্ভ প্রকাশ করেছে। অথচ অনুরূপ একটি কুরআন বা তার মত দু'একটি সূরা বা আয়াত জিন-ইনসান সকলকে একত্রিত হয়ে রচনা করে আনার জন্য মক্কায় পাঁচবার ১৫৭ এবং মদীনায় একবার (বাক্বারাহ ২/২৩-২৪) সহ মোট ছয়বার কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু সে যুগে ও এ যুগে কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। বরং দেখা গেছে যে, সে যুগে ঐসব নেতারাই গোপনে রাতের অন্ধকারে বাইরে
দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনত। আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আখনাস বিন শারীক, আবু জাহল প্রমুখ নেতারা একে অপরকে না জানিয়ে গোপনে একাজ করত' । কিন্তু যখন তারা তাদের জনগণের সামনে যেত, তখন তাদের মন্তব্য পাল্টে যেত। কারণ তখন দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে সত্যভাষণ থেকে ফিরিয়ে রাখত। একই অবস্থা আজকালকের মুসলিম-অমুসলিম নেতাদের। যাদের অধিকাংশ রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের সত্যতাকে স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে তা মানতে রাযী হয় না স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে।

এভাবে কাফেররা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত নানারূপ মানসিক কষ্ট দেয়। এ সময় আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا 'তারা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে

পরিহার করে চল' (মুযযাম্মিল ৭৩/১০)। তিনি আরও বলেন, إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 'বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট' (হিজর ১৫/৯৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন তাঁর চাচা আবু লাহাব। তিনি ও তার স্ত্রী ছাড়াও কষ্টদানকারী অন্যান্য প্রতিবেশী ছিল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া, উকুবা বিন আবু মু'আইত্ব, 'আদী বিন হামরা ছাক্বাফী, ইবনুল আছদা আল-হুযালী। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেবল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইনিই ছিলেন উমাইয়া বংশের অন্যতম খলীফা মারওয়ানের পিতা। বস্তুতঃ মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ বাদে মারওয়ানের বংশধরগণই ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের পরপর খলীফা। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নানাবিধ অত্যাচার চালায়। তাতে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ তোমার পূর্বের বহু রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। কিন্তু এ মিথ্যারোপে তারা ছবর করেছেন এবং তারা নির্যাতিত হয়েছেন যতক্ষণ না তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আর আল্লাহ্র বাণীসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এ বিষয়ে নবীগণের কিছু খবর তোমার নিকটে পৌঁছে গেছে (যার মধ্যে তোমার জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে)' (আন'আম ৬/৩৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন যে, একদিন রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহর পাশে

ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসে বলাবলি করতে লাগল, কে উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে এই ব্যক্তির উপর চাপাতে পারে, যখন সে সিজদায় যাবে? তখন ওকুবা বিন আবী মু'আইতু উটের ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুঁড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এতে শত্রুরা হেসে লুটোপুটি খেয়ে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে থাকে। ইবন মাসউদ বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ছিল না। এই সময় ফাতেমার কাছে খবর পৌঁছলে তিনি দৌড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

আতিয়ার রাসুল (সাঃ) মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন-

'হে আল্লাহ তুমি কুরায়েশকে ধর (তিনবার)! হে আল্লাহ তুমি আমর ইবনে হেশাম (আবু জাহল)-কে ধর। হে আল্লাহ তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, অলীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওকুবা বিন আবু মু'আইত্ব এবং উমারাহ বিন অলীদকে ধর'। ইবনু মাস'উদ বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি'। উটের ভুঁড়ি চাপানোর এই নির্দেশ আবু জাহলই দিয়েছিলেন এবং অন্যেরা তা মেনে নিয়েছিল। সেমতে তার আগের দিন উটসমূহ নহর করা হয়েছিল।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নেককার ব্যক্তির দো'আ বা বদ দো'আ অবশ্যই আল্লাহর নিকটে কবুল হয়। তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে হ'তে পারে অথবা আল্লাহ তার থেকে অনুরূপ একটি কষ্ট দূর করে দেন অথবা সেটি আখেরাতে প্রদানের জন্য রেখে দেন'। কিন্তু আখেরাতের জন্য রেখে দেওয়ার কারণে বদকারগণ ঐ বদ দো'আরকোন গুরুত্ব দেয় না। বরং পুনরায় কঠিনভাবে শত্রুতা করতে থাকে। যেমন আবু জাহল গং রাসূল (ছাঃ)-এর বদ দো'আ শুনে ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে তা ভুলে যায় এবং বিপুল উৎসাহে শত্রুতা করতে থাকে। ফলে এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পর বদর যুদ্ধে তাদের উপরে উক্ত বদ দো'আর বাস্তবায়ন ঘটে ও সব নেতা একত্রে নিহত হয়। আর বদর যুদ্ধের পর এক সপ্তাহের মধ্যে আরেক নেতা আবু লাহাব গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে পচে-গলে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় মক্কায় নিজ গৃহে মারা যায়। এভাবে মযলুম নবী বিজয়ী হন ও যালেম নেতারা ধ্বংস হয়।

একদিন ছালাতরত অবস্থায় ওকুবা বিন আবু মু'আইত্ব এসে গলায় জোরে কাপড় পেঁচিয়ে ধরল, যাতে রাসূল (ছাঃ) নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান। জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে গিয়ে এ খবর দিলে আবুবকর (রাঃ) ছুটে এসে পেঁচানো কাপড় খুলে দিলেন ও বদমাইশ গুলোকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, ‘ তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছ, যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট

থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের কাছে আগমন করেছেন?' এ সময় তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ছেড়ে আবুবকরকে বেদম প্রহার করে')।

সম্মুখে অপার সাথে নিন্দা করা অভিশাপ দেয়ার ব্যাপারে  অন্যতম প্রতিবেশী উমাইয়া বিন খালাফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি পশ্চাতে সর্বদা নিন্দা করতেন। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলেই তাঁর সামনে গিয়ে যাচ্ছে-তাই বলে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করতেন এবং তাঁকে অভিশাপ দিতেন। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়, নিন্দাকারীর জন্য'

.

একদা  উমাইয়া বিন খালাফের ভাই উবাই বিন খালাফ ছিল আরেক দুরাচার। সে যখন শুনতে পেল যে, তার সাথী ওকবা বিন আবু মু'আইত্ব রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসে কিছু আল্লাহর বাণী শুনেছে, তখন ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ওকুবাকে বাধ্য করল যাতে সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে আসে। ওকুবা তাই-ই করল'। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় , 'জালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম'। 'হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। 'আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' (ফুরকান ২৫/২৭-২৯)।

অনুরূপ এক ঘটনায় একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমি সূরা নাজমের ১ ও ৮ আয়াত فَتَدَلّٰى ثُمَّ دَنَا ... وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) দু'টিকে অস্বীকার করি, বলেই সে হেঁচকা টানে রাসূল (ছাঃ)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অথচ এই হতভাগা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা। যে তার পিতার কথা মত রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছুমকে তালাক দেয়। তার ভাই উৎবা একইভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর অপর কন্যা রুক্বাইয়াকে তালাক দেয়। পরে যার বিয়ে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে উম্মে কুলছুমের সাথে ওছমান (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বদ দো'আ করে বললেন, اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلابك 'হে আল্লাহ! তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও'। ১৬৬

উবাই বিন খালাফ নিজে একবার পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ধারণা কর যে, একটা মানুষ মরে পচে-গলে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে হাতে রাখা পচা হাড়ের গুঁড়া তাঁর মুখের উপরে ছুঁড়ে মারে' । যেমন আল্লাহ বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم 'মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, হাড়গুলিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে-গলে যাবে?' 'বলে দাও, ওগুলিকে জীবিত করবেন তিনি, যিনি প্রথমবার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ' (ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)। এছাড়া এ প্রেক্ষিতে সূরা মারিয়াম ৬৬, ক্বাফ ৩ ও অন্যান্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়। যদিও শানে নুযূল হিসাবে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সনদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মুরসাল'। তবে এটা নিশ্চিত যে, বিভিন্ন প্রশ্ন ও ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরে প্রশান্তি আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً - وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ - وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا 'কাফেররা বলে যে, কেন কুরআন তাঁর প্রতি একসাথে নাযিল হল না?

এমনিভাবেই আমরা এটি নাযিল করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি, যাতে আমরা তোমার অন্তরকে দৃঢ় করতে পারি'। 'তারা তোমার নিকটে কোন সমস্যা উত্থাপন করলেই আমরা তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে থাকি' (ফুরকান ২৫/৩২-৩৩)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্যাতনকারীদের মধ্যে অন্যতম সেরা একজন ব্যক্তি ছিল, যে ছিল জারজ সন্তান। সে ভাল মানুষ সেজে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে মিথ্যা শপথ করে কথা বলত এবং পরে লোকদের কাছে গিয়ে চোগলখুরী করত। ঐ নেতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, আখনাস বিন শারীকু ছাক্বাফী, কেউ বলেছেন, অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী ইত্যাদি (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)। তবে শেষোক্ত নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও ইকরিমা বলেন, এই ব্যক্তি ছিল ব্যভিচারের সন্তান। সে কুরায়েশ বংশজাত ছিল না।)।

তার এই বাড়াবাড়ির কারণ ছিল তার অতুল বিত্ত-বৈভবের অহংকার। যেমন আল্লাহ বলেন, أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ - سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ

'আর এটা এ কারণে যে, সে ছিল বহু মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক'। 'যখন তার সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এসব পুরাকালের কাহিনী'। 'সত্বর আমরা তার নাসিকা দাগিয়ে দেব' (কুলম ৬৮/১৪-১৬)। হাতী বা শূকরের শুঁড়কে আরবীতে 'খুরভূম' বলা হয়। এখানে ঐ ব্যক্তির নাম সম্পর্কে এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার হীনতা ও নিকৃষ্টতা প্রকাশ করার জন্য। ক্বিয়ামতের দিন তার নাকে খৎ দিয়ে নাসিকা দাগিয়ে দিয়ে চিহ্নিত করা হবে এজন্য যে, অন্যের সামনে তার লাঞ্ছনা যেন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে সে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত থেকে নাক সিঁটকিয়েছিল। ফলে ক্বিয়ামতের দিন তার বদলা হিসাবে তার নাসিকা দাগানো হবে। একাজ অন্যেরা করলেও তার পাপ ছিল বেশী। কেননা সে ছিল নেতা। তাই তাকে সেদিন সর্বসমক্ষে চিহ্নিত করা হবে। نعوذ بالله من غضبه وقهره

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর সামনে বসে কুরআন শোনার পর তাকে অস্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে গর্ভের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে যাওয়ার কাজটা প্রায়ই আবু জাহল করত, আর ভাবত আমি মুহাম্মাদকে ও তার কুরআনকে গালি দিয়ে একটা দারুণ কাজ করলাম। অথচ তার এই কুরআন শোনাটা ছিল কপটতা এবং লোককে একথা বুঝানো যে, আমার মত আরবের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটেই যখন কুরআনের কোন মূল্য নেই, তখন তোমরা কেন এর পিছনে ছুটবে? এ যুগের বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ পণ্ডিত ও জ্ঞানপাপী মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। যারা দিনরাত রাসূল (ছাঃ) কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে মূলতঃ অন্যকে ইসলামথেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। লোকেরা ভাবে, তারা বড় বড় জ্ঞানী। তারা কি কিছুই বুঝেন না? অথচ তারা এ ব্যাপারে একেবারেই গোমর্থ। আবু জাহলের এই কপট ও উদ্ধত আচরণের কথা বর্ণনা করেন আল্লাহ এভাবে- فلا صدق ولا صلى - ولكن كذب وتَوَلَّى - ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى 'সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাত আদায় করেনি'। 'পরন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে

ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে'। 'অতঃপর সে দম্ভভরে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে' (ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩১-৩৩)। এক বর্ণনায় এসেছে যে, এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) আবু জাহলকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, أولى لك فَأَوْلَى - ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ‘তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ'। 'অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ' (ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৪-৩৫)।১৬৮

নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই ছালাত ফরয হয়। তবে তখন ছালাত ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু' দু' রাক'আত করে (কুরতুবী)। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ সকালে (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে)'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে ছিল দু' দু' রাক'আত করে। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'অতিরিক্ত' (نافلة) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত (ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন।

প্রথম দিকে সবাই সেটা গোপনে আদায় করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা প্রকাশ্যে কা'বাগৃহে আদায় করতে থাকেন। একদিন তিনি ছালাত আদায় করছেন। এমন সময় আবু জাহল গিয়ে তাঁকে ধমকের সুরে বলল, يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ ‘মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এসব থেকে নিষেধ করিনি?'

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দেন। এতে সে বলে, يَا مُحَمَّدُ بِأَيِّ شَيْءٍ تُهَدِّدُنِي؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَكْثَرُ هَذَا الْوَادِي نَادِيًا -‘হে মুহাম্মাদ? আল্লাহর কসম! মক্কার এই উপত্যকায় আমার বৈঠক সবচেয়ে বড়'। অর্থাৎ আমার দল সবচেয়ে ভারি। তখন আল্লাহ সূরা 'আলাক্ব-এর নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন। ১৭২

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى - إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى -عَبْداً إِذَا صَلَّى - أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى -أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ - فَلْيَدْعُ نَادِيه - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ - كلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ - (العلق ٦-١٩)

'কখনোই না। নিশ্চয়ই মানুষ সীমালংঘন করে' (৬)। 'এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে' (৭)। 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তন স্থল' (৮)। 'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে (আবু জাহলকে) যে নিষেধ করে?' (৯)। 'এক বান্দাকে (রাসূলকে), যখন সে ছালাত আদায় করে' (১০)। 'তুমি কি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে' (১১)। 'অথবা আল্লাহভীতির আদেশ দেয়' (১২)। 'তুমি কি দেখেছ যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়' (১৩)। 'সে কি জানেনা যে, আল্লাহ তার সবকিছুই দেখেন' (১৪)। 'কখনোই না। যদি সে বিরত না হয়, তবে আমরা অবশ্যই তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে সজোরে টান দেব' (১৫)। 'মিথ্যুক পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ' (১৬)। 'অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডাকুক' (১৭)। 'আমরাও অচিরে ডাকব আযাবের ফেরেশতাদের' (১৮)। 'কখনোই না। তুমি তার কথা শুনবে না। তুমি সিজদা কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ কর' ('আলাক ৯৬/৬-১৯)।

আবু জাহল ও রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যকার এই ঘটনা স্মরণ করে এই আয়াত পাঠের পর পাঠক ও শ্রোতাকে একটি সিজদা করার বিধান দেওয়া হয়েছে'। ১৭৩ আর এটাই হ'ল কুরআনের ১৫তম ও সর্বশেষ সিজদার আয়াত' (দারাকুনী হা/১৫০৭)। উল্লেখ্য যে, এই সিজদার জন্য ওযু, কিবলা বা সালাম করা শর্ত নয়।

সূরা 'আলাকু-এর উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর আবু জাহল মনে মনে ভীত হ'লেও বাইরে ঠাট বজায় রেখেই চলেন। একদিন তিনি কুরায়েশ নেতাদের সামনে বলে বসেন, লাত ও উয্যার কসম! যদি মুহাম্মাদকে পুনরায় সেখানে ছালাতরত দেখি, তাহ'লে নিশ্চিতভাবেই আমি তার ঘাড়ের উপরে পা দিয়ে তার নাকমুখ মাটিতে আচ্ছামত থেৎলে দেব' (মুসলিম)। পরে একদিন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সেখানে ছালাতরত অবস্থায় দেখলেন। তখন নেতারা তাকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উসকে দিল। ফলে তিনি খুব আস্ফালন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু না। হঠাৎ দেখা গেল যে, তিনি ভয়ে পিছিয়ে আসছেন। আর দুই হাত শূন্যে উঁচু করে কি যেন এড়াতে চেষ্টা করছেন'। পিছিয়ে এসে তিনি ভয়ে কাঁপতে

কাঁপতে বললেন, আমার ও তার মধ্যে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড দেখলাম, যা আমার দিকে ধেয়ে আসছিল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ دَنَا مِنِّى لاَخْتَطَفَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عُضْوًا عُضْوا 'যদি সে আমার কাছে পৌঁছত, তাহ'লে ফেরেশতারা তার এক একটা অঙ্গ ছিন্ন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত'। আশ্চর্যের বিষয়, এতবড় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহ্র সরাসরি সাহায্য প্রত্যক্ষ করেও আবু জাহল তার হঠকারিতা থেকে পিছিয়ে আসেননি কেবলমাত্র নেতৃত্বের অহংকারে স্ফীত হওয়ার কারণে। নমরূদ, ফেরাউন ও আবু জাহল সহ যুগে যুগে সকল হঠকারী নেতাদের চরিত্র একই।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) যখন কা'বায় গিয়ে ছালাত আদায় করতেন, তখন কাফের নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে কা'বাগৃহে আসত। অতঃপর ইবাদতের নাম করে তারা সেখানে জোরে জোরে তালি বাজাত ও শিস দিত। যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো যায়। এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاّ مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون বলতে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব (কিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে) তোমরা অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন কর' (আনফাল ৮/৩৫)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতদ্ব্যতীত আবু জাহল অন্যান্যদেরকে প্ররোচিত করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমরা হৈ-হুল্লোড় ও হট্টগোল করবে, যাতে কেউ তার তেলাওয়াত শুনতে না পায়। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوْا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوْنَ - (فصلت ٢٦-٢٧)-

'আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শুনোনা এবং এর তেলাওয়াত কালে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা বিজয়ী হও'। 'আমরা অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব এবং আমরা অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম বদলা দেব'

(ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/২৬-২৭)। এছাড়াও তারা নানাবিধ গালি দিত। তখন নাযিল - وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

ছালাতের ক্বিরাআতে স্বর অধিক উঁচু করো না বা একেবারে নীচু করো না। বরং দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর' (ইসরা ১৭/১১০)।১৭৫

নেতারা নও মুসলিমদের সম্মুখে এবং নিজেদের লোকদের সম্মুখে জোরে-শোরে একথা প্রচার করত যে, যদি মুহাম্মাদ সত্যনবী হ'তেন ও তার আনীত কুরআন সত্য কিতাব হ'ত, তাহ'লে তা অমান্য করার অপরাধে আমাদের উপরে ভূতের কওমের মত গযব নাযিল হয় না কেন? বস্তুতঃ তাদের এসব কথা দ্বারা দুর্বলদের মন আরও দুর্বল হয়ে যেত এবং ইসলাম কবুল করা হ'তে পিছিয়ে যেত। তাদের এই দাবী ও তার জওয়াবে আল্লাহ বলেন, ولا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَأَمْطَرْ عَلَيْنَا حجارة من السَّمَاء أو ما بعذاب أليم وما كان الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُم يسترون - الأنفال (٣٢-٣٣)

আর স্মরণ কর, যখন তারা প্রার্থনা করেছিল, যদি এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সত্য (নবী) হয়ে থাকে তোমার পক্ষ হতে, তাহ'লে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও'। 'অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তমি (হে মুহাম্মাদ!) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা (অর্থাৎ মক্কার দুর্বল মুসলিমরা। ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে'

অথচ একবার গযব নেমে এলে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের অবাধ্য উম্মতসমূহের অবস্থা হয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজ উম্মতের জন্য সেটা কখনোই চাননি।

আয়াত দু'টির মর্মকথা (مغزى الآيتين المذكورتين) :

প্রথম আয়াতে কাফের নেতাদের একটি কূট কৌশল বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সত্যনবী হ'লে তাকে অমান্য করার কারণে আমাদের উপরে গযব নাযিল হয় না কেন? অথচ তারা ভালভাবেই জানত যে, আল্লাহ তার বান্দাদের বুঝার ও তওবা করার অবকাশ দিয়ে থাকেন। প্রতিটি অপরাধের কারণে যখন-তখন গযব নাযিল করে তাদের ধ্বংস করেন না। যেমন আল্লাহ ফেরাউনের মত দুরাচারকেও অন্যূন বিশ বছরের মত সময় দিয়েছিলেন এবং নানা প্রকার গযব নাযিল করেও যখন সে তওবা করেনি, তখন তাকে সদলবলে ডুবিয়ে মারেন। মক্কার কাফিররাও ভেবেছিল যেহেতু গযব নাযিল হচ্ছে না, অতএব আমরা ঠিক পথে আছি। মুহাম্মাদ নিজে ধর্মত্যাগী হয়েছে এবং সে আমাদের জামা'আতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে।

বস্তুতঃ যুগে যুগে কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা নিজেদেরকে সঠিক এবং সংস্কারবাদী নেতাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে দাবী করেছে। মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন তার লোকদের একই কথা বলে বুঝিয়েছিল যে, وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشاد 'আমি তোমাদেরকে সর্বদা কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' (মুমিন/গাফের ৪০/২৯)। আর মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে বলল لاظ كاذبا '' 'আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি' (মুমিন/গাফের ৪০/৩৭)। সে ধর্ম রক্ষা ও দেশে শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে তাকে হত্যা করার ঔষধ সৃষ্টি করে বলেছিলالْفَسَادَ الْأَرْضِ فِي يُظْهِرَ أَنْ أَوْ نَكُمْ دِيَ يُبَدِّلَ 'তোমরা আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করব।ডাকুক, সে তার রবকে। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেবে এবং সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে' (মুমিন/গাফের ৪০/২৬)। মক্কার নেতারা একই কথা বলেছিল। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে 'ছাবেঈ' (صابئ অর্থাৎ 'ধর্মত্যাগী এবং 'কাযযাব' (كذاب অর্থাৎ 'মহা মিথ্যাবাদী' এবং 'সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী' বলেছিল। ১৭৭ আর সেকারণ তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ কাফেরদের কথার জওয়াবে বলেন, যতক্ষণ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করবে অথবা তোমার হিজরতের পরেও যতদিন মক্কার দুর্বল ঈমানদারগণ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, ততদিন আমরা তাদের উপর

গযব নাযিল করব না। কারণ একজন নবী বা ঈমানদারের মূল্য সমস্ত আরববাসী এমনকি সকল বিশ্ববাসীর চাইতে বেশী। এ কারণেই হাদীছে এসেছে, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللهُ الل 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন পৃথিবীতে একজন আল্লাহ বলার মত (প্রকৃত তাওহীদপন্থী ঈমানদার) লোক বেঁচে থাকবে'। ১৭৮

বস্তুতঃ ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপরে সে গযবই নাযিল হয়েছিল। কেননা যে দুনিয়ার লোভে তারা ইসলামকে সত্য জেনেও তার বিরোধিতায় জীবনপাত করেছিল, সেই দুনিয়াবী নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সবই তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় মক্কা বিজয়ের দিন এবং সেদিন তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়। নিজেদের জীবদ্দশায় বিনা যুদ্ধে এরূপ মর্মান্তিক পতন প্রত্যক্ষ করা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী শাস্তি নয় কি? বরং আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণে নিহত হওয়ার চাইতে এটিই ছিল কুরায়েশ নেতাদের জন্য আরও কঠিন গযব ও হৃদয়বিদারক শাস্তি। যুগে যুগে সত্য এভাবেই বিজয়ী হয়েছে। আজও হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

প্রয়োজন কেবল ঈমানদার ও নিঃস্বার্থ নেতা এবং যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী দল।

## ছাহাবীগণের উপরে অত্যাচার

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মানসিক ও দৈহিক অত্যাচারের কিছু ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এক্ষণে আমরা তাঁর সাথীদের উপরে অত্যাচারের কিছু নমুনা পেশ করব।-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, প্রথম সাতজন ব্যক্তি তাদের ইসলাম প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, 'আম্মার ও তার মা সুমাইয়া, ছোহায়েব, বেলাল ও মিকদাদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ নিরাপত্তা দেন তাঁর চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে, আবুবকরকে নিরাপত্তা দেন তার গোত্রের মাধ্যমে। আর বাকীদের মুশরিকরা পাকড়াও করে। তাদেরকে তারা লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে ফেলে রাখে। তারা যেভাবে খুশী নির্যাতন করে। কিন্তু বেলালের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। সে নিজেকে আল্লাহর উপর সঁপে দিয়েছিল। লোকেরা তার পিছনে ছোকরাদের লেলিয়ে দেয়। তারা তাকে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরায়। আর সে বলতে থাকে আহাদ, আহাদ'। ১৭৯ এখানে সাতজনের মধ্যে সুমাইয়ার স্বামী ইয়াসিরকে ধরা হয়নি। যদিও তিনিও ছিলেন একই সময়ের নির্যাতিত ছাহাবী' (আল-ইছাবাহ, 'আম্মার ক্রমিক ৫৭০৮)।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের উপরে কাফিরদের এই অত্যাচারের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না কিংবা উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ছিল না। তবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সচ্ছল ও উঁচু স্তরের লোকদের চাইতে গরীব ও ক্রীতদাস শ্রেণীর মুসলমানদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ছিল অনেক বেশী, যা অবর্ণনীয়। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ জাহেলী যুগে ছাহাবীগণের উপর নির্যাতনের কিছু নমুনা পেশ করা হ'ল।-

**)১) বেলাল বিন রাবাহ** : যিনি কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাকে তার মনিব অবর্ণনীয় নির্যাতন করে। তার গলায় দড়ি বেঁধে গরু-ছাগলের মত ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে পাহাড়ে ও প্রান্তরে টেনে-হিঁচড়ে ঘুরানো হ'ত। তাতে তার গলার চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যেত। খানাপিনা বন্ধ রেখে তাকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দেওয়া হ'ত। কখনো উত্তপ্ত কংকর-বালুর উপরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হ'ত আর বলা لاَ تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى পরিত্যাগ এবং লাত-'উযযার পূজা না করা পর্যন্ত তোকে আমৃত্যু এভাবেই পড়ে থাকতে হবে'। কিন্তু বেলাল শুধুই বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ' (ইবনু হিশাম ১/৩১৭-১৮)। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখে বললেন 'আহাদ অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন'। অতঃপর তিনি এসে আবুবকে বললেন  হে আবুবকর। বেলাল আল্লাহর পথে শাস্তি ভোগ করছে'।

আবুবকর ইঙ্গিত বুঝলেন। অতঃপর উমাইয়ার দাবী অনুযায়ী নিজের কাফের গোলাম নিসতাস )"نسطاس(-এর বিনিময়ে এবং একটি মূল্যবান চাদর ও দশটি উকিয়ার )স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে তাকে খরীদ করে মুক্ত করে দেন। ১৮০ ওমর (রাঃ) বলেন, أبو بكر سَيِّدُنَا ، وَاعْتَقَ سَيِّدَنَا، يعنى بلالا আমাদের নেতাকে'। এর দ্বারা তিনি বেলালকে বুঝাতেন ১৮১ ওমর (রাঃ)-এর এই কথার মধ্যে ইসলামী সাম্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। বেলাল (রাঃ) ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মুওয়াযযিন ছিলেন। তিনি ২০ হিজরী সনে ৬৩ বছর বয়সে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন'

**(২) 'আমের বিন ফুহায়রাহ )**( : আবুবকরের মুক্তদাস ছিলেন। হিজরতের রাতে ইনি সার্বিক খিদমতে ছিলেন। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে সংঘটিত বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় ৭০জন শহীদের অন্যতম ছিলেন

**(৩)** উম্মে উবাইস, যিন্নীরাহ, নাহদিয়াহ ও তার মেয়ে এবং বনু মুআম্মাল-এর জনৈকা দাসী মুসলমান হ'লে তারা সবাই বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হন। ইবনু ইসহাক বলেন, যিন্নীরাহকে যখন তিনি মুক্ত করেন, তখন সে অন্ধ ছিল। কুরায়েশরা বলল, লাত-'উযযার অভিশাপে সে অন্ধ হয়ে গেছে। তখন যিন্নীরাহ বলল, ওরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্র ঘরের কসম! ১৮২ লাত-'উযযা কারু কোন ক্ষতি করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা'। তখনই আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন'।

এভাবে সর্বশেষ বেলালকে নিয়ে হিজরতের পূর্বে মোট ৭জন দাস-দাসীকে আবুবকর মুক্ত করেন (হাকেম হা/৫২৪১ হাদীছ ছহীহ)। এবিষয়ে একদিন তার পিতা আবু কুহাফা তাকে বলেন, বেটা! আমি দেখছি তুমি যত দুর্বল দাস-দাসী মুক্ত করছ। যদি তুমি শক্তিশালী ও সাহসী কিছু লোককে মুক্ত করতে, তাহ'লে তারা তোমাকে রক্ষা করত এবং তোমার পক্ষে যুদ্ধ করত! জবাবে আবুবকর বলেন, হে পিতা! আমি তো কেবল আল্লাহর জন্যই এগুলি করেছি। অতঃপর তাঁর সম্পর্কে 'সূরা লায়েল' নাযিল হয়

# হাবশায় হিজরত

## প্রথম হিজরত

চতুর্থ নববী বর্ষের মাঝামাঝি থেকে মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন শুরু হয় ৫ম নববী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ তা চরম আকার ধারণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মযলুম মুসলমানদের রক্ষার জন্য উপায় খুঁজতে থাকেন। তিনি আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী হাবশার ন্যায়নিষ্ঠ খ্রিষ্টান রাজা আছহামা নাজাশী (أَصْحَمَةُ النَّجَاشِي)-র সুনাম শুনে আসছিলেন যে, তার রাজ্যে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয়। অতএব তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ শেষে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে নবুঅতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার প্রথম দলটি রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। এই দলে রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা 'রুক্বাইয়া' ছিলেন। ২০০ ভাগ্যক্রমে ঐ সময় লোহিত সাগরের বন্দর শো'আইবাহ (ميناء شعيبة)-তে দু'টো ব্যবসায়ী জাহায নোঙর করা ছিল। ফলে তারা খুব সহজে তাতে সওয়ার হয়ে হাবশায় পৌঁছে যান। কুরায়েশ নেতারা পরে জানতে পেরে দ্রুত পিছু নিয়ে বন্দর পর্যন্ত গমন করে। কিন্তু তারা নাগাল পায়নি।

## হাবশায় ২য় হিজরত

হাবশার বাদশাহ কর্তৃক সদাচরণের খবর শুনে কুরায়েশ নেতারা মুসলমানদের উপরে যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং কেউ যাতে আর হাবশায় যেতে না পারে, সেদিকে কড়া নযর রাখতে লাগল। কারণ এর ফলে তাদের দু'টি ক্ষতি ছিল। এক- বিদেশের মাটিতে কুরায়েশ নেতাদের যুলুমের খবর পৌঁছে গেলে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। দুই- সেখানে গিয়ে মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে। কিন্তু তাদের

অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি এবং কড়া নযরদারী সত্ত্বেও জা'ফর বিন আবু ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ বা ১৯জন মহিলা দ্বিতীয়বারের মত হাবশায় হিজরত করতে সমর্থ হন। এই দলে 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ছিলেন কি-না সন্দেহ আছে'।

তাফসীরবিদগণের আলোচনায় আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, ৫ম নববী বর্ষে মুহাজিরগণের দ্বিতীয় যে দলটি হাবশায় হিজরত করেন, তাদের সাথে হযরত জা'ফর বিন আবু তালেব সম্ভবতঃ দু'বছর হাবশায় অবস্থান করেন। তিনি নাজাশী ও তাঁর সভাসদমণ্ডলী এবং পোপ-পাদ্রী-বিশপসহ রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। এ সময় নাজাশীর দরবারে জা'ফরের দেওয়া ভাষণ নাজাশী ও তার সভাসদগণের অন্তর কেড়ে নেয়। ইসলামের সত্যতা ও শেষনবীর উপরে তাদের বিশ্বাস তখনই বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতঃপর হাবশার মুহাজিরগণ যখন মদীনায় যাওয়ার সংকল্প করেন, তখন সম্রাট নাজাশী তাদের সাথে ৭০ জনের একটি ওলামা প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেন। যাদের মধ্যে ৬২ জন ছিলেন আবিসিনীয় এবং ৮ জন ছিলেন সিরীয়। এরা ছিলেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সেরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সংসার বিরাগী দরবেশ সূলভ পোষাকে এই প্রতিনিধিদলটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনান। এ সময় তাদের দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে। তারা বলে ওঠেন ইনজীলের বাণীর সাথে কুরআনের বাণীর কি অদ্ভুত মিল! অতঃপর তারা সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন।

প্রতিনিধি দলটির প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজাশী প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। যদিও প্রথম থেকেই তিনি শেষনবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ধর্মনেতাদের ভয়ে প্রকাশ করেননি। অতঃপর তিনি একটি পত্র লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল মদীনায় পাঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাযটি পথিমধ্যে ডুবে গেলে আরোহী সকলের মর্মান্তিক সলিল সমাধি ঘটে।

উক্ত খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলের মদীনায় গমন ও ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করেই সূরা মায়েদাহ ৮২ হ'তে ৮৫ চারটি আয়াত নাযিল হয়।

হাবশায় গিয়ে যাতে মুসলমানগণ শান্তিতে থাকতে না পারে, সেজন্য কুরায়েশ নেতারা কুটনীতিবিদ আমর ইবনুল 'আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আহকে দায়িত্ব দিল। তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করল। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা কুশামবুদ্ধি এ দু'জন পরে মুসলমান হন। ১ম জন ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এবং ২য় জন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর। আব্দুল্লাহ ছিলেন আবু জাহলের বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই।

নাম ছিল বুহায়রা (بحرى)/ ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ' তারা মহামূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে হাবশা যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে খ্রিষ্টানদের নেতৃস্থানীয় ধর্মনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের ক্ষুরধার যুক্তি এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদিতে ভুলে দরবারের পাদ্রী নেতারা একমত হয়ে যান। পরের দিন আমর ইবনুল 'আছ উপঢৌকনাদি নিয়ে বাদশাহ নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তারা বললেন, হে বাদশাহ! আপনার দেশে আমাদের কিছু অজ্ঞ-মূর্খ ছেলে-ছোকরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যারা তাদের কওমের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে এবং তারা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি। তারা এমন এক নতুন দ্বীন নিয়ে এসেছে, যা আমরা কখনো শুনিনি বা আপনিও জানেন না। আমাদের কওমের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফেরৎ পাঠান'। তাদের কথা শেষ হ'লে উপস্থিত পাদ্রীনেতাগণ কুরায়েশ দূতদ্বয়ের সমর্থনে মুহাজিরগণকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করেন। তখন বাদশাহ রাগতঃ স্বরে বলেন, আল্লাহর কসম! এটা কখনোই হ'তে পারে না। তারা আমার দেশে এসেছে এবং অন্যদের চাইতে আমাকে পসন্দ করেছে। অতএব তাদের বক্তব্য না শুনে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। ফলে তাঁর নির্দেশক্রমে জা'ফর বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু সিজদা করলেন না। বাদশাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা প্রথানুযায়ী আমাকে সিজদা করলে না কেন? যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের কওমের প্রতিনিধিদ্বয় এসে করেছে? বাদশাহ আরও বললেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ

করে এমনকি আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করে নতুন যে ধর্মে তোমরা দীক্ষা নিয়েছ, সেটা কী, আমাকে শোনাও!'

জা'ফর বিন আবু ত্বালিব বললেন, হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মের নাম 'ইসলাম'। আমরা স্রেফ আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ বললেন, কে তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছেন? জা'ফর বললেন, আমাদের মধ্যেরই একজন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতা এবং অন্যায় ও অত্যাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের মধ্যে তাঁর শেষনবীকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ'। তিনি আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, সংযমশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণাবলী আমরা জানি। নবুঅত লাভের পর তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম হ'তে তওবা করে সৎকর্মশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এক আল্লাহর ইবাদত করছি ও হালাল-হারাম মেনে চলছি। এতে আমাদের কওমের নেতারা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আমাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছেন। সেকারণ বাধ্য হয়ে আমরা সবকিছু ফেলে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছি আপনার সুশাসনের খবর শুনে। আমরা অন্যস্থান বাদ দিয়ে আপনাকে পসন্দ করেছি এবং আপনার এখানেই আমরা থাকতে চাই। আশা করি আমরা আপনার নিকটে অত্যাচারিত হব না'।

অতঃপর জাফর বললেন, হে বাদশাহ! অভিবাদন সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের জানিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীদের পরস্পরে অভিবাদন হ'ল 'সালাম' এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পরস্পরে 'সালাম' করার নির্দেশ দিয়েছেন'।

বাদশাহ বললেন, ঈসা ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও?

উত্তরে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সূরা মারিয়ামের শুরু থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে শুনান। যেখানে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিবরণ, মারিয়ামের

প্রতিপালন, ঈসার জন্মগ্রহণ ও লালন-পালন, মাতৃক্রোড়ে কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং তাওরাত-ইনজীলে পণ্ডিত ব্যক্তি। কুরআনের অপূর্ব বাকভঙ্গি, শব্দশৈলী ও ভাষালংকার এবং ঘটনার সারবত্তা উপলব্ধি করে বাদশাহ অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকলেন। সাথে উপস্থিত পাদ্রীগণও কাঁদতে লাগলেন। তাদের চোখের পানিতে তাদের হাতে ধরা ধর্মগ্রন্থগুলি ভিজে গেল। إِنَّ 'নিশ্চয়ই এই কালাম এবং ঈসার নিকটে যা নাযিল হয়েছিল দু'টি একই আলোর উৎস থেকে নির্গত'। বলেই তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের দিকে ফিরে বললেন, انْطَلِقَا فَلَا وَاللهِ لَا أُسْلِمُهُم 'তোমরা চলে যাও! আল্লাহর কসম! আমি কখনোই এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না'।

আমর ইবনুল 'আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহ দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমর বললেন, কালকে এসে এমন কিছু কথা বাদশাহকে শুনাবো, যাতে এদেরমূলোৎপাটন হয়ে যাবে এবং এরা ধ্বংস হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেন, না, না এমন নিষ্ঠুর কিছু করবেন না। ওরা আমাদের স্বগোত্রীয় এবং নিকটাত্মীয়। কিন্তু আমর ওসব কথায় কর্ণপাত করলেন না।

পরের দিন বাদশাহর দরবারে এসে তিনি বললেন, أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيمًا - হে সম্রাট। এরা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে ভয়ংকর সব কথা বলে থাকে'। একথা শুনে বাদশাহ মুসলমানদের ডাকালেন। মুসলমানেরা একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কেননা নাছারারা ঈসাকে উপাস্য মানে। কিন্তু মুসলমানরা তাকে 'আল্লাহর বান্দা' (عبد الله) বলে থাকে। যাই হোক কোনরূপ দ্বৈততার আশ্রয় না নিয়ে তারা সত্য বলার ব্যাপারে মনস্থির করলেন। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করে দিয়ে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব বললেন هو عبد الله of t وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ ولم يَمَسُّهَا بَشَرٌ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত রূহ এবং তাঁর নির্দেশ। যা

তিনি মহীয়সী কুমারী মাতা মারিয়ামের উপরে ফুঁকে দিয়েছিলেন। কোন পুরুষ লোক তাকে স্পর্শ করেনি'। তখন নাজাশী মাটি থেকে একটা কাঠের টুকরা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, وَاللهِ مَا عَدَا عِيسَى بن مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُود 'আল্লাহর কসম! তুমি যা বলেছ,

ঈসা ইবনে মারিয়াম তার চাইতে এই কাষ্ঠখণ্ড পরিমাণও বেশী ছিলেন না'। তিনি اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِى - وَالسُّيُومُ الآمِنُونَ، مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ (ثلاث مرات). مَا أُحِبُّ ْأَنْ لِي دَبَرًا مِنْ ذَهَبٍ وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلاً مِنْكُم

'যাও! তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে ব্যক্তি তোমাদের গালি দিবে, তার জরিমানা হবে (৩বার)। তোমাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে যদি কেউ আমাকে স্বর্ণের পাহাড় এনে দেয়, আমি তা পসন্দ করব না'। অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি ফেরৎ দানের নির্দেশ দিলেন।

ঘটনার বর্ণনাদানকারিণী প্রত্যক্ষ সাক্ষী হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) (পরবর্তীকালে উম্মুল মুমেনীন) বলেন, فَخَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ ... وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ، مَعَ خير جَارٍ 'অতঃপর ঐ দু'জন ব্যক্তি চরম বেইযযতির সাথে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল... এবং আমরা উত্তম প্রতিবেশীর সাথে উত্তম গৃহবাসীরূপে বসবাস করতে থাকলাম'। ফালিল্লাহিল হাম্দ।
আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, তারা শেষনবীর আবির্ভাবের খবর শুনে ৫০-এর অধিক লোক নিয়ে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইয়ামন থেকে নৌকায় মদীনা রওয়ানা হন।

কিন্তু ঝড়ে তাদের নৌকা হাবশায় গিয়ে নোঙর করে। ফলে তারা সেখানে অবতরণ করেন এবং জাফর ও তার সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তারা সেখানেই থেকে যান। পরে জাফরের সাথে তারা ৭ম হিজরীতে খায়বরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হন। قال وأبو مُوسَى شَهِدَ مَا جَرَى بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ النَّجَاشِي، 'আবু মূসা আশ'আরী জা'ফর ও নাজাশীর মধ্যকার আলোচনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন'।

## আপোষহীন

ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য নিবর্তনমূলক সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে কুরায়েশদের ১০জন নেতা একত্রে আবু তালিবের কাছে এলেন। এই দলে ছিলেন ওবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, আবু সুফিয়ান ছাখর ইবনু হারব, আবুল বাখতারী 'আছ বিন

হিশাম, আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব, আবু জাহল আমর ইবনু হেশাম (যিনি 'আবুল হাকাম' উপনামে পরিচিত ছিলেন), অলীদ বিন মুগীরাহ, নুবাইহ ও মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ ও 'আছ বিন ওয়ায়েল এবং আরও কয়েকজন যারা তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা এসে বলল 'হে আবু তালেব! আপনার ভাতিজা আমাদের উপাস্যদের গালি দিয়েছে, আমাদের দ্বীনকে দোষারোপ করেছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা ঠাউরেছে এবং আমাদের বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট মনে করেছে'। এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন। নতুবা আমাদের ও তার মাঝ থেকে আপনি সরে দাঁড়ান। কেননা আপনিও আমাদের ন্যায় তার আদর্শের বিরোধী। সেকারণ আমরা আপনাকে তার ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করি'। ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনে আবু তালেব তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে বিদায় করলেন

মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্যাতনের ভয়ে সকলে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজ্য হাবশায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ায় নেতারা প্রমাদ গুণলেন। অতঃপর বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য এবং হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমর ইবনুল 'আছ ও আবু জাহলের বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহকে নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুহাম্মাদের দাওয়াত একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে অথবা তাকে হত্যা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যেকোন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পথে সবচাইতে বড় বাধা হ'লেন তার চাচা বর্ষীয়ান ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় গোত্রনেতা আবু তালিব। ফলে নেতারা পুনরায় আবু তালেবের কাছে এলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে বয়সে, সম্মানে ও পদমর্যাদায় আপনি বিশেষ স্থানের অধিকারী। আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বিরত রাখবেন। কিন্তু আপনি তাকে বিরত রাখেননি। আল্লাহর কসম! আমরা আর এ ব্যক্তির ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে পারছি না। কেননা এ ব্যক্তি আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দিচ্ছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা বলছে, আমাদের উপাস্যদের দোষারোপ করছে'। এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন, নয়তো আমরা তাকে ও আপনাকে এ ব্যাপারে একই পর্যায়ে নামাবো। যতক্ষণ না আমাদের দু'পক্ষের একটি পক্ষ ধ্বংস হয়'। গোচোনা একবার এই চূড়ান্ত হুমকি শুনে আবু তালেব দুশ্চিন্তায় পড়লেন অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডেকে এনে বললেন

হে ভাতিজা তোমার বংশের নেতারা আমার কাছে এসেছিলেন এবং তারা এই এই কথা বলেছেন।... অতএব তুমি আমার উপরে এমন বোঝা চাপিয়ো না, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই'। চাচার এই কথা শুনে তিনি তাকে ছেড়ে যাচ্ছেন ধারণা করে সাময়িকভাবে বিহ্বল নবী আল্লাহর উপরে গভীর আস্থার খেয়ে বলে উঠলেন, ‘এর চাচাজি যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তাওহীদের এই দাওয়াত বন্ধ করার বিনিময়ে, আমি তা কখনোই পরিত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ এই দাওয়াতকে বিজয়ী করেন অথবা আমি তাতে ধ্বংস হয়ে যাই' বলেই তিনি অশ্রুভরা নয়নে চলে যেতে উদ্যত হলেন। পরম স্নেহের ভাতিজার এই অসহায় দৃশ্য দেখে বয়োবৃদ্ধ চাচা তাকে পিছন থেকে ডাকলেন। তিনি তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই চাচা বলে উঠলেন ভাতিজা! তুমি যা খুশী প্রচার কর। আল্লাহ্র কসম! কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব না'।

কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে আপোষ প্রস্তাবের ফাঁদে আটকানোর চিন্তা করেন। সে মোতাবেক তারা মক্কার অন্যতম নেতা ওৎবা বিন রাবী'আহকে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে পাঠান।

একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা চত্বরে একাকী বসেছিলেন। তখন কুরায়েশ নেতাদের অনুমতি নিয়ে ওৎবা তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! তুমি আমাদের গোত্রের মধ্যে কেমন সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় আছ, তা তুমি ভালভাবেই জান।

একটি ভয়ানক বিষয় নিয়ে এসেছ। তুমি তাদের জামা'আতকে বিভক্ত করেছ। তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছ। তাদের উপাস্যদের ও তাদের দ্বীনকে তুমি মন্দ বলেছ। এই দ্বীনের উপর মৃত্যুবরণকারী তাদের বাপ-দাদাদের তুমি কাফের বলেছ'। অতএব আমি তোমার নিকটে কয়েকটি বিষয় পেশ করছি। এগুলি তুমি ভেবে দেখ, আশা করি তুমিসেগুলির কিছু হ'লেও মেনে নিবে। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, বলুন! হে আবু অলীদ, আমি শুনব। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তোমার এই নতুন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্য যদি সম্পদ উপার্জন হয়, তাহ'লে তুমি বললে আমরা তোমাকে সেরা ধনী

বানিয়ে দেব। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব লাভ হয়, তাহ'লে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব। আর যদি আরবের বাদশাহ হ'তে চাও, তাহ'লে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব। আর যদি মনে কর, তোমার মাথার জন্য জিনের চিকিৎসা প্রয়োজন, তাহ'লে আমরাই তা আরোগ্যের জন্য সেরা চিকিৎসককে এনে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব এবং সব খরচ আমরাই বহন করব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এমনকি নেতারা এ প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, তুমি নারীদের মধ্যে যাকে চাও, তার সাথে তোমাকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিব। আমাদের একটাই মাত্র দাবী, তুমি তোমার ঐ নতুন দ্বীনের দাওয়াত পরিত্যাগ কর'।

জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ৫৪ আয়াত বিশিষ্ট সূরা হা-মীম সাজদাহ পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। শুনতে শুনতে ওৎবা মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, যখন রাসূল (ছাঃ) ১৩তম আয়াত পাঠ করলেন, তখন ওৎবা রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের উপরে হাত চেপে গযব নাযিলের ভয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর দোহাই! তুমি তোমার বংশধরগণের উপরে দয়া কর'। অতঃপর ৩৮তম আয়াতের পর রাসূল (ছাঃ) সিজদা করলেন এবং উঠে বললেন, قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ 'আবুল অলীদ আপনি তো সবকিছু শুনলেন। এখন আপনার যা বিবেচনা হয় করুন'। এরপর ওৎবা উঠে গেলেন।

কুরায়েশ নেতারা সাগ্রহে ওৎবার কাছে জমা হ'লে তিনি বললেন, নেতারা শুনুন! আমি মুহাম্মাদের মুখ থেকে এমন বাণী শুনে এসেছি, যেরূপ বাণী আমি কখনো শুনিনি। যা কোন কবিতা নয় বা জাদুমন্ত্র নয়। সে এক অলৌকিক বাণী। আপনারা আমার কথা শুনুন! মুহাম্মাদকে বাধা দিবেন না। তাকে তার পথে ছেড়ে দিন'। লোকেরা হতবাক হয়ে বলে উঠলো سَحَرَكَ وَاللهِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ بِلِسَانِه 'আল্লাহর কসম হে আবুল অলীদ। মুহাম্মাদ তার কথা দিয়ে আপনাকে জাদু করে ফেলেছে'। ২১৬

একদিন যখন রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করছিলেন, তখন আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, অলীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালাফ, 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রস্তাব দেন, -আমরা ইবাদত করি, যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর, যার আমরা ইবাদত করি। তাতে আমরা

ও তুমি আমাদের উপাসনার কাজে পরস্পরে অংশীদার হব'। তখন আল্লাহ সূরা কাফেরূন নাযিল করেন। যাতে কাফেরদের সঙ্গে পুরাপুরি বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করা হয়।

হুমকি, লোভনীয় প্রস্তাব ও বয়কট কোনটাতে কাজ না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে আবু তালিবের স্বাস্থ্যহানির খবর শুনে মক্কার নেতারা তৃতীয়বার তাঁর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া বিন খালাফ, ওৎবা ও শায়বা বিন রাবী'আহ সহ প্রায় ২৫ জন নেতা আবু তালেবের কাছে আসেন এবং বলেন, হে আবু তালেব! আপনি যে মর্যাদার আসনে আছেন, তা আপনি জানেন। আপনার বর্তমান অবস্থাও আপনি বুঝতে পারছেন। আমরা আপনার জীবনাশংকা করছি। এমতাবস্থায় আপনি ভালভাবে জানেন যা আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষণে আপনি তাকে ডাকুন এবং উভয় পক্ষে অঙ্গীকার নিন যে, সে আমাদের ও আমাদের দ্বীন থেিরত থাকবে এবং আমরাও তার থেকে বিরত থাকব। তখন আবু তালেব রাসূল (ছাঃ)-কে ডাকালেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মুখে এসে একটি কালেমার ওয়াদা আপনারা আমাকে দিন। তাতে আপনারা আরবের বাদশাহী পাবেন এবং অনারবরা আপনাদের অনুগত হবে'। আবু জাহল খুশী হয়ে বলে উঠল, তোমার পিতার কসম, এমন হলে একটা কেন দশটা কালেমা পাঠ করতে রাযী আছি।

আপনারা বলুন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। আর তাঁকে ছাড়া অন্য যাদের পূজা করেন, সব পরিত্যাগ করুন'।

তখন তারা দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠলো ‘হে মুহাম্মাদ! সব উপাস্য বাদ দিয়ে তুমি একজন উপাস্যচাও? নিশ্চয়ই তোমার এ বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর!' এরপর তারা পরস্পরে বলল, 'আল্লাহর  কসম! এই ব্যক্তি তোমাদের কিছুই দিবে না, যা তোমরা চাচ্ছ। অতএব 'চলো! তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্মের উপরে চলতে থাক যতক্ষণনা আল্লাহ তোমাদের ও তার মধ্যে একটা ফায়ছালা করে দেন'। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা ছোয়াদের ১ হতে ৭ আয়াতগুলি নাযিল করেন।-

ص، وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ - كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ إِلَهًا وَاحِداً إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الهَتِكُمْ إِنْ هَذَا لَشَيْءٍ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا

(ص - إلا اختلاق ١-٧)

(১) ছোয়াদ- শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের (২) বরং কাফেররা অহমিকা ও হঠকারিতায় লিপ্ত (৩) তাদের পূর্বেকার কত জনগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করেছি। তারা আর্তনাদ করেছে। কিন্তু বাঁচার কোন উপায় তাদের ছিল না (৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এতো একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী (৫) সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্যকে সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার (৬) তাদের নেতারা একথা বলে চলে যায় যে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই (মুহাম্মাদের) এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত (৭) আমরা তো পূর্বেকার ধর্মে এরূপ কোন কথা শুনিনি। এটা মনগড়া উক্তি বৈ কিছু নয়' (ছোয়াদ ৩৮/১-৭)

চতুর্থ ও শেষবার নেতারা এসেছিলেন আবু তালিবের মৃত্যুকালে, যেন তিনি তাওহীদের কালেমা পাঠ না করেন ও বাপ-দাদার ধর্মে তথা শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন, সেটা নিশ্চিত করার জন্য। বস্তুতঃ একাজে তারা সফল হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর শত আকুতি উপেক্ষা করে সেদিন আবু তালেব আবু জাহলের কথায় সায় দিয়ে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন।

## দুই শক্তিশালীর ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সরাসরি দৈহিক আক্রমণের দুঃসাহস দেখানোর কঠিন সময়ে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে কুরায়েশ বীর হামযা ইসলাম কবুল করেন।

হামযার ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে যিলহাজ্জ মাসের কোন এক দিনে ছাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অশ্লীল ভাষায় তাঁকে ও তাঁর দ্বীনকে গালি দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নীরবে সবকিছু সহ্য করেন ও চুপচাপ বাড়ী আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের জনৈকা দাসী ছাফা পাহাড়ে তার বাসা থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করেশ ঐ সময় হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব মৃগয়া থেকে তীর-ধনুকে সজ্জিত অবস্থায় ঘরে ফিরছিলেন। তখন উক্ত দাসী তার নিকটে সব ঘটনা খুলে বললে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটলেন আবু জাহলের খোঁজে। তিনি গিয়ে আবু জাহলকে মাসজিদুল হারামে পেলেন। অতঃপর তীব্র ভাষায় তাকে গালি দেন ও তার মাথায় ধনুক দিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, আবু জাহল তাতে রক্তাক্ত হয়ে যান। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি। আমি তাই বলি যা সে বলে'। অতঃপর আবু জাহলের বনু মাখযূম গোত্র এবং হামযার বনু হাশেম গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে চড়াও হয়। তখন আবু জাহল বলেন, তোমরা আবু উমারাহ (হামযা)-কে ছাড়। আমি তার ভাতিজা (মুহাম্মাদ)-কে নিকৃষ্ট ভাষায় গালি দিয়েছি'। এভাবে আবু জাহল নিজের দোষ স্বীকার করে নিজ গোত্রকে নিরস্ত করেন। ফলে আসন্ন খুনোখুনি থেকে উভয় পক্ষ বেঁচে যায়। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল'। তবে ঘটনাটি অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এটি আক্বীদা বা আহকামগত বিষয় নয়। এ ঘটনায় আবু জাহলের নেতৃত্ব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, হামযার এই ইসলাম কবুলের ঘোষণাটি ছিল আকস্মিক এবং ভাতিজার প্রতি ভালোবাসার টানে। পরে আল্লাহ তাঁর অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে শক্তিশালী ও নির্ভর কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ) ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত এবং একটি দৃঢ় রক্ষাকবচ।ন

হামযার ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিন দিন পরেই আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আরেকজন কুরায়েশ বীর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আকস্মিকভাবে মুসলমান হয়ে যান। ওয়াক্বেদীর

হিসাব মতে, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর এবং তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪০ থেকে ৫৬ জন। যাদের মধ্যে ১০ বা ১১ জন ছিলেন নারী। এটি ছিল হাবশায় প্রথম হিজরতের পরের ঘটনা। ইবনু কাছীর বলেন, ওমরকে দিয়ে মুসলমানের সংখ্যা ৪০ পূর্ণ হয়, কথাটি সঠিক নয়। কেননা তার পূর্বে ৮০ জনের উপরে মুসলমান হাবশায় হিজরত করেছিল। তবে এটি হ'তে পারে যে, দারুল আরকামে গিয়ে ইসলাম কবুল করার সময়ে সেখানে মুসলিম নারী-পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪০-এর কাছাকাছি (। অন্য বর্ণনায় এসেছে ৩৯ জন)। ফলে সেদিন ওমরকে দিয়ে ৪০ পূর্ণ হয়।তিনি যে আগে থেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, হাবশা যাত্রী মহিলা মুহাজির উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে আবু হাছমাহ বলেন, আমরা হাবশা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার স্বামী 'আমের তখন প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে ছিলেন। এমন সময় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। বললেন, এগুলি মনে হয় চলে যাওয়ার প্রস্তুতি? বললাম, হ্যাঁ। আমরা অবশ্যই আল্লাহর যমীনে বেরিয়ে যাব। তোমরা আমাদের কষ্ট দিচ্ছ ও নির্যাতন করছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা পথ বের করে দিবেন'। তখন ওমর বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের সাথী হৌন'! এদিন আমি তাকে অত্যন্ত দুঃখিত ও সংবেদনশীল দেখতে পাই'। রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমের জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ছিলেন। যিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তার মায়ের সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তার সমালোচনা করেননি। ইবনু হিব্বান তার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন'। ২২৪ তবে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, বোন ফাতেমার গৃহে প্রবেশ ও তার নিকট থেকে কুরআন শ্রবণ তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ হ'তে পারে। ২২৫ কিন্তু উক্ত বিষয়ে বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনাটির সনদ 'যঈফ'।

এছাড়াও মতনে বৈপরিত্য আছে। যেমন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশ নেতারা তাকে পাঠিয়েছিলেন। কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিজ থেকে গিয়েছিলেন' (ইবনু সা'দ, দারাকুনী)। কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি বোনের ঘরে সূরা ত্বোয়াহা ও সূরা তাকভীর ১৪ আয়াত পর্যন্ত পড়েছিলেন' (। কোন বর্ণনায় এসেছে সূরা হাদীদ' পড়েছিলেন ()। অথচ সূরা হাদীদ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে বায়তুল্লাহতে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত অবস্থায় সূরা হা-ক্কাহ শুনে তার অন্তরে ইসলাম দৃঢ় হয়' ( অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি রাতের বেলা কা'বার গেলাফের মধ্যে লুকিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের ক্বিরাআত শুনছিলেন। তিনি বলেন, এমন কথা আমি কখনো

শুনিনি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে গেলে আমি তাঁর পিছু নেই। তখন তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, ওমর। তিনি বললেন, হে ওমর! দিনে-রাতে কখনোই তুমি আমার পিছু নিতে ছাড়ো না'। আমি ভয় পেয়েগেলাম যে, উনি আমাকে বদ দো'আ করতে পারেন। তখন আমি কালেমা শাহাদাত পাঠ করলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন 'হে ওমর! এটি গোপন রাখ'। আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই প্রকাশ করব, যেভাবে শিরক প্রকাশ করতাম')। উল্লেখ্য যে, দুর্বল সূত্র সমূহের আধিক্য সবসময় কোন বর্ণনার শক্তি বৃদ্ধি করেনা। বরং অনেক সময় তার দুর্বলতাই বৃদ্ধি করে। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন'
আমরা মনে করি ওমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ দো'আর ফল। কেননা তিনি তাঁর জন্য খাছভাবে দো'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব-এর মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'হে আল্লাহ! আবু জাহল অথবা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি তোমার নিকট অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর'। পরের দিন সকালে ওমর দারুল আরকামে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলাম কবুল করেন এবং কা'বাগৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করেন'। এতে প্রমাণিত হয় যে, ওমরই ছিলেন আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি।

তবে এটা নিশ্চিত যে, ওমর ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আরবী ভাষালংকারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ফলে কুরআনের সারগর্ভ ও আকর্ষণীয় বাকভঙ্গি এবং কিয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনাসমূহ তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। যা তাকে ইসলামের দিকে চুম্বকের মত টেনে আনে। সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ তাঁর শানে কবুল হওয়ায় তিনি দ্রুত এসে ইসলাম কবুল করেন।

হামযা ও ওমর (রাঃ)-এর পরপর মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কুরায়েশরা দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে এতে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ ও সাহসের সঞ্চার হ'লেও দূরদর্শী ও স্নেহশীল চাচা আবু ত্বালিবের বুকটা ভয়ে সব সময় দুরু দুরু করত কখন কোন মুহূর্তে শয়তানেরা আকস্মিকভাবে মুহাম্মাদকে হামলা করে মেরে ফেলে। সবদিক ভেবে তিনি একদিন স্বীয় প্রপিতামহ 'আব্দে মানাফের দুই পুত্র হাশেম ও মুত্ত্বালিবের বংশধরগণকে একত্রিত করলেন। অতঃপর তাদের সামনে বললেন, এতদিন আমি

এককভাবে ভাতিজা মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধান করেছি। কিন্তু এখন এই চরম বার্ধক্যে ও প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশে আমার পক্ষে এককভাবে আর মুহাম্মাদের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব নয়। সেকারণ আমি তোমাদের সকলের সহযোগিতা চাই'

গোত্রনেতা আবু ত্বালিবের এই আহ্বানে ও গোত্রীয় আকর্ষণে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং মুহাম্মাদের হেফাযতের ব্যাপারে সবাই একযোগে তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। একমাত্র চাচা আবু লাহাব বিরোধিতা করল এবং সে মুহাম্মাদের বিপক্ষ দলের প্রতি সমর্থন দানের ঘোষণা দিল'।

## বয়কট

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরপর চারটি ঘটনায় মুশরিক নেতাদের মধ্যে যেমন আতংক সৃষ্টি হয়, তেমনি মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ঘটনাগুলি ছিল যথাক্রমে- (১) মুহাম্মাদকে প্রদত্ত আপোষ প্রস্তাব ও লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ নাকচ হওয়া। (২) হামযার ইসলাম গ্রহণ ও সরাসরি আবু জাহলের উপরে হামলা করা। (৩) ওমরের ইসলাম গ্রহণ ও সরাসরি আবু জাহলের বাড়ীতে গিয়ে তার মুখের উপর তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেওয়া। অতঃপর মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিধি-বিধান সমূহ পালন শুরু করা এবং (৪) সবশেষে আবু ত্বালিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের মুসলিম-কাফির সকলের পক্ষ হ'তে মুহাম্মাদকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের অঙ্গীকার ঘোষণা করা। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মুশরিক নেতৃবৃন্দ মুহাছছাব উপত্যকায় সমবেত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকলে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, (১) বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের সাথে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে (২) তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যাবতীয় লেন-দেন বন্ধ থাকবে (৩) তাদের সাথে উঠাবসা, মেলা-মেশা, কথাবার্তা ও তাদের বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ থাকবে- যতদিন না তারা মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দিবে।

৭ম নববী বর্ষের ১লা মুহাররমের রাতে সম্পাদিত উক্ত অঙ্গীকারনামাটি কা'বাগৃহের ভিতরে টাঙিয়ে রাখা হ'ল। উক্ত অঙ্গীকারনামার লেখক বাগীয বিন 'আমের -এর প্রতি রাসূল (ছাঃ) বদ দো'আ করেন। ফলে তার হাতটি অবশ ও অকেজো হয়ে যায়।
উপরোক্ত অন্যায় চুক্তি সম্পাদনের ফলে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব উভয় গোত্রের তাদের অবস্থা চরমে ওঠে। ফলে তারা গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হন। নারী ও শিশুরা ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত। তাদের ক্রন্দন ধ্বনি গিরি সংকটের বাইরের লোকেরা শুনতে পেত। ফলে কেউ কেউ অতি সংগোপনে তাদের কাছে খাদ্য পৌছাতো। একবার হাকীম বিন হেযাম স্বীয় ফুফু খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে গম পৌছাতে গিয়ে আবু জাহলের হাতে ধরা পড়ে যান। কিন্তু আবুল বাখতারীর হস্তক্ষেপে অবশেষে সমর্থ হন। হারামের চার মাস ব্যতীত অবরুদ্ধ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা বের হতে পারতেন না। যেসব কাফেলা বাহির থেকে মক্কায় আসত, তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ক্রয়ে বাধা ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মক্কার ব্যবসায়ীরা জিনিষ-পত্রের এমন চড়া মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল যে, তা ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে আবু তালিবের দুশ্চিন্তা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন নিয়ে। রাতের বেলা সকলে শুয়ে যাওয়ার পর তিনি রাসূলকে উঠিয়ে এনে তার বিশ্বস্ত নিকটাত্মীয়দের সাথে বিছানা বদল করাতেন। যাতে কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পায়। উক্ত কঠোর অবরোধ চলাকালীন সময়েও হজ্জের মওসুমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহিরাগত কাফেলা সমূহের তাঁবুতে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। ওদিকে চাচা আবু লাহাব তাঁর পিছে পিছে গিয়ে লোকদেরকে তাঁর কথা না শোনার জন্য বলতেন ।

প্রায় তিন বছর পূর্ণ হ'তে চলল। ইতিমধ্যে মুশরিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও দ্বিধা-বিভক্তি প্রকাশ্য রূপ নিল। যারা এই অন্যায় চুক্তিনামার বিরোধী ছিল, তারা ক্রমেই সংগঠিত হ'তে লাগল। বনু 'আমের বিন লুওয়াই গোত্রের হেশাম বিন আমরের উদ্যোগে যোহায়ের বিন আবু উমাইয়া ও মুত্ব'ইম বিন 'আদী সহ পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হারামের নিকটবর্তী 'হাজুন' নামক স্থানে বসে এ ব্যাপারে একমত হন এবং তাঁদের পক্ষে যোহায়ের কা'বাগৃহ তাওয়াফ শেষে প্রথম সরাসরি আবু জাহলের মুখের উপরে উক্ত চুক্তিনামাটি ছিড়ে ফেলার হুমকি দেন। সাথে সাথে বাকী চারজন পরপর তাকে সমর্থন করেন। আবু জাহল বললেন, বুঝেছি। তোমরা রাতের বেলা অন্যত্র পরামর্শ

করেই এসেছ'। ঐ সময়ে আবু ত্বালিব কা'বা চত্বরে হাযির হ'লেন। তিনি কুরায়েশ নেতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তোমাদের চুক্তিনামা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, 'আল্লাহ ঐ অঙ্গীকারপত্রের উপরে কিছু উঁই পোকা প্রেরণ করেছেন। তারা এর মধ্যকার বয়কট এবং যাবতীয় অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কথাগুলোখেয়ে ফেলেছে, কেবল আল্লাহর নামগুলি ব্যতীত'। অতঃপর আবু তালেব বললেন, -মিথ্যা বলে থাকে, তাহ'লে তোমাদের ও তার মধ্য থেকে আমরা সরে দাঁড়াব। আর যদি তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তোমরা আমাদের প্রতি বয়কট ও যুলুম থেকে ফিরে যাবে'। আবু ত্বালিবের এই সুন্দর প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'আপনি ইনছাফের কথাই বলেছেন'। ওদিকে আবু জাহল ও মুতু'ইম এবং অন্যান্যদের মধ্যে বাকযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুত্ব'ইম বিন 'আদী কা'বাগৃহে প্রবেশ করে অঙ্গীকারনামাটি ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে এলেন। দেখা গেল যে, সত্য সত্যই তার সব লেখাই পোকায় খেয়ে ফেলেছে কেবলমাত্র 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা' ('আল্লাহ তোমার নামে শুরু করছি') বাক্যটি এবং অন্যান্য স্থানের আল্লাহ্ নামগুলি ব্যতীত। এভাবে আবু ত্বালিবের মাধ্যমে প্রেরিত রাসূল (ছাঃ)-এর প্রাপ্ত অহীর সংবাদ সত্যে পরিণত হ'ল। কুরায়েশ নেতারা অবাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করল। অতঃপর অঙ্গীকারনামাটি মুতু 'ইম বিন 'আদী সর্বসমক্ষে ছিঁড়ে ফেললেন এবং এভাবে বয়কটের অবসান ঘটল ঠিক তিন বছরের মাথায় ১০ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসে'।

নবুঅতের সত্যতার এ চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও নেতাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অহংকারী

'আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা এড়িয়ে যায় আর বলে এসব চলমান জাদু' (ক্বামার ৫৪/২)।

বলা বাহুল্য সকল যুগের হঠকারী নাস্তিক ও মুনাফিকের চরিত্র একই রূপ।

# আবু ত্বালিব ও খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু

১০ম নববী বর্ষের মুহাররম মাসে ঠিক তিন বছরের মাথায় বয়কট শেষ হওয়ার ৬ মাস পরে রজব মাসে আবু ত্বালিবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আবু জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া প্রমুখ মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শিয়রে বসে ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে চাচাজী! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি তার কারণে আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষ্য দান করতে পারি'। জবাবে আবু ত্বালিব বলেন, 'হে ভাতিজা! যদি আমার পরে তোমার বংশের উপর গালির ভয় না থাকত এবং কুরায়েশরা যদি এটা না ভাবত যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে এটা বলেছি ও তোমাকে খুশী করার জন্য বলেছি, তাহ'লে আমি অবশ্যই ওটা বলতাম' । অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন আবু জাহল ও তার সহোদর বৈপিত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বারবার তাঁকে উত্তেজিত করতে থাকেন এবং বলেন, 'আপনি কি আব্দুল মুত্ত্বালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন'? জবাবে আবু ত্বালিবের মুখ দিয়ে শেষ বাক্য বেরিয়ে যায়, 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের দ্বীনের উপরে' । তখন রাসূলুল্লাহ )ছাঃ) বলে উঠলেন, 'আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব। যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়'। ফলে আয়াত নাযিল হয়- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْم 'নবী ও ঈমানদারগণের জন্য সিদ্ধ নয় যে, তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করুক মুশরিকদের জন্য। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী' (তওবা ৯/১১৩)।

এরপর রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে আয়াত নাযিল হয়।

যাকে তুমি ভালবাসো। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করে থাকেন। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত' (ক্বাছাছ ২৮/৫৬)। উল্লেখ্য যে, সূরা তওবাহমাদানী সূরা হ'লেও তার মধ্যে ১১১-১১৩ আয়াত তিনটি বায়'আতে কুবরা ও আধু তালিবের মৃত্যু প্রসঙ্গে মক্কায় নাযিল হয় (তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কারীর)।

এভাবে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা স্বীয় ভাতিজাকে সবকিছুর বিনিময়ে আমৃত্যু আগলে রেখেও শেষ মুহূর্তে এসে পরকালীন সৌভাগ্যের পরশমণি হাতছাড়া হয়ে গেল। স্নেহসিক্ত ভাতিজার প্রাণভরা আকুতি ব্যর্থ হ'ল এবং শয়তানের প্রতিমূর্তি গোত্রনেতাদের প্ররোচনা জয়লাভ করল। পিতৃধর্মের বহুত্ববাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হ'লেন। এ দৃশ্য যে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য কত বেদনাদায়ক ছিল, তা আখেরাতে বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিনগণ উপলব্ধি করতে পারেন। কেননা যে চাঙা দুনিয়াবী কারাগারের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে সর্বদা ঢালের মত তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং নিজে অমানুষিক কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন, সেই চাচা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরে পুনরায় জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবেন, এটা তিনি কিভাবে ভাবতে পারেন? বলা বাহুল্য এভাবেই সর্বদা তাক্বদীর বিজয়ী হয়ে থাকে।

একদিন চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আখেরাতে আবু তালিবের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাবপ্রাপ্ত হবেন আবু জ্বালিব। তিনি আগুনের দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যাতে তাঁর মাথার মগয গলে টগবগ করে ফুটবে'। প্রিয় চাচা আব্বাস (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আবু তালেব আপনাকে যেভাবে হেফাযত ও সহযোগিতা করেছেন, তার বিনিময়ে আপনি কি তাঁকে কোন উপকার করতে পারবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে দেখতে পেলাম। অতঃপর তাকে (আল্লাহর হুকুমে) সেখান থেকে)। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, সম্ভবতঃ কিয়ামতের দিন আমার সুফারিশ তার উপকারে আসবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামের অগভীর স্থানে নেওয়া হবে, যা তার টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাতেই তার মস্তিষ্ক আগুনে টগবগ করে ফুটবে, যেমন উত্তপ্ত কড়াইয়ে পানি ফুটে থাকে'।

অতএব আবু তালিবের এই হালকা আযাব তার আমলের কারণে নয়, বরং তা হবে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুফারিশের কারণে। আর সেটা হবে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত ও তার উচ্চ মর্যাদার কারণে, যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন।কেননা আবু ত্বালিব শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আবু জ্বালিব আমৃত্যু তার শিরকী দ্বীনের উপর পাকার পিছনে আল্লাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত ছিল। সেটি এই যে, তিনি ইসলাম কবুল কালে মুশরিকদের নিকট তার মর্যাদা থাকত না এবং তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সাহায্যও করতে পারতেন না। বরং তাঁর কারণেই কাফিররা রাসূল (ছাঃ)-কে সমীহ করত। জীসন দিয়ে সাহায্য করা সত্ত্বেও আল্লাহ তার তাক্বদীরে ঈমান রাখেননি। এর মধ্যে বড় হিকমত রয়েছে। আমাদেরকে তার উপরে ঈমান রাখতে হবে। যদি মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আল্লাহ নিষেধ না করতেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা আবু তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম ও তাঁর প্রতি দয়ার্দ্যচিত্ত হ'তাম'।

স্নেহশীল চাচা আবু ত্বালিবের মৃত্যুর অনধিক তিন মাস পরে দশম নববী বর্ষের রামাযান মাসে প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা 'তাহেরা'-র মৃত্যু হয় (আর-রাহীকু ১১৬ পৃঃ)। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আবু ত্বালিবের মৃত্যুর তিন দিন পরে খাদীজার মৃত্যু হয় (যাদুল মা'আদ ৩/২৮)। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫০ বছর।

দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ বয়কটকালীন নিদারুণ কষ্ট অবসানের মাত্র ৬ মাসের মাথায় চাচা, অতঃপর স্ত্রীকে হারিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত ও আশ্রয়হারা নবীর অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে পারেন। চাচা আবু তালেব ছিলেন সামাজিক জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ঢাল স্বরূপ। অন্যদিকে পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনে খাদীজা ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ততম নির্ভরকেন্দ্র। দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছর সেবা ও সাহচর্য দিয়ে, বিপদে শক্তি ও সাহস যুগিয়ে, অভাব-অনটনে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ ধ্যান ও সাধনাকালে অকুণ্ঠ সহমর্মিতা দিয়ে, নতুনের শিহরণে ভীত-চকিত রাসূলকে অনন্য সাধারণ প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে, অতুলনীয় প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জীবন্ত নে'মত স্বরূপ। তিনি ছিলেন শেষ সন্তান ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (ছাঃ)-এর সকল সন্ত ানের মা। তিনি ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতাজান্নাতী মহিলাদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম'।

খাদীজা (রাঃ) ছিলেন সেই মহীয়সী মহিলা যাকে জিব্রীল নিজের পক্ষ হ'তে ও আল্লাহর পক্ষ হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে তাঁকে সালাম দেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন।

তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ) অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার মৃত্যুর পরেও আজীবন রাসূল (ছাঃ) তাকে বারবার স্মরণ করেছেন। অন্য স্ত্রীদের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে তার প্রশংসা করেছেন। এমনকি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে খাদীজার বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন।ছ মহিলার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম'।

## তায়েফ সফর ও বহিরাগতদের ইসলাম গ্রহণ

চাচা আবু ত্বালিব ও স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পর দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মে মাসের শেষে অথবা জুন মাসের প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে প্রধানতঃ নতুন সাহায্যকারীর সন্ধানে পদব্রজে (৩।اشيًا على قدميه) ত্বায়েফ রওয়ানা হন।*** এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫০ বছর। এই প্রৌঢ় বয়সে এই দীর্ঘ পথ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। যা ছিল মক্কা হ'তে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৯০ কি. মি. দূরে।

অতঃপর ত্বায়েফ পৌঁছে তিনি সেখানকার বনু ছাক্বীফ গোত্রের তিন নেতা তিন সহোদর ভাই আব্দু ইয়ালীল, মাসঊদ ও হাবীব বিন আমর ছাক্বাফী-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। সাথে সাথে ইসলামকে সাহায্য করার জন্য

তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত তিন ভাইয়ের একজনের কাছে কুরায়েশ-এর অন্যতম গোত্র বনু জুমাহ -এর একজন মহিলা বিবাহিতা ছিলেন (সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনজনই তাঁকে নিরাশ করেন। একজন বলেন, 'সে কা'বার গোলাফ ছিঁড়ে ফেলবে, যদি আল্লাহ তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়ে থাকেন'।

অন্যজন বলেন, আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া অন্য

কাউকে রাসূল হিসাবে পাঠানোর জন্য পাননি'?

কোন কথাই বলব না। কেননা যদি তুমি সত্যিকারের নবী হও, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে তোমার সাথে আমার কথা বলা সমীচীন নয়'।

নেতাদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে এবার তিনি অন্যদের কাছে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ তার দাওয়াত কবুল করেনি। অবশেষে দশদিন পর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য পা বাড়ান। এমন সময় নেতাদের উস্কানীতে বোকা লোকেরা ও ছোকরার দল এসে তাঁকে ঘিরে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়।এক পর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। যাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী ফেটে রক্তে জুতা ভরে যায়'। এ সময় যায়েদ বিন হারেছাহ ঢালের মত থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রস্তরবৃষ্টি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। এভাবে রক্তাক্ত দেহে তিন মাইল হেঁটে তায়েফ শহরের বাইরে তিনি এক আঙ্গুর বাগিচায় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নেন। তখন ছোকরার দল ফিরে যায়। বাগানটির মালিক ছিলেন মক্কার দুই নেতা উৎবা ও শায়বা বিন রাবী'আহ দুই ভাই। এই উৎবার কন্যা ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা। যিনি ওহোদ যুদ্ধের দিন কাফের পক্ষে মহিলা দলের নেতৃত্ব দেন এবং পরে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।

ত্বায়েফ থেকে ফেরার পথে জিনেরা কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করে। জিনেরা দু'বার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফ

সফর থেকে ফেরার পথে তিনি ওকায বাজারের দিকে যাত্রাকালে নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন। তখন জিনেরা সেই কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করল এবং তাদের জাতির কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের জাতি! কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না' ।

দ্বিতীয় বারের বিষয়ে ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গেল, নাকি কেউ অপহরণ করল। আমরা চারদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। রাতটি ছিল আমাদের জন্য খুবই 'মন্দ রাত্রি' (شَرُّ لَيْلَةٍ)। সকালে তাঁকে আমরা হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম'। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং জিনদের নমুনা ও তাদের আগুনের চিহ্নসমূহ দেখালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা শুকনা হাড্ডি ও গোবর ইস্তিঞ্জাকালে ব্যবহার করো না। এগুলি তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য' (মুসলিম হা/৪৫০)। উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসউদ কর্তৃক আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছে কয়লার কথাও বলা হয়েছে (আবুদাউদ হা/৩৯)।

তায়েফ সফরের ঘটনাবলীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করলেন এবং সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অতঃপর 'নাখলা' উপত্যকায় পৌঁছে সেখানকার জনপদে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এখানেই জিনদের প্রথম ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। যা সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে এবং সূরা জিন ১-১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের কথা তিনি তখনই জানতে পারেননি। বরং পরে সূরা জিন নাযিলের পর জানতে পারেন। অতঃপর সূরা আহক্বাফ ৩২ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, কোন শক্তিই তার দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবে না। যেখানে আল্লাহ বলেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না, সে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে সাহায্যকারীও

পাবে না। বস্তুতঃ তারাই হ'ল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত' (। এতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মনের মধ্যে আরও শক্তি অনুভব করেন। নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন পাঠ শুনে নাছীবাইন

এলাকার নেতৃস্থানীয় জিনদের ৭ বা ৯জনের অনুসন্ধানী দলটি তাদের সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, সেখানে বক্তব্যের শুরুতে তারা কুরআনের 'আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি'। 'যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তার উপরে ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে কখনোই শরীক করব না' )। অতঃপর তারা বলে, আমরা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে

পরাজিত করতে পারব না এবং তাঁর থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারব না' (জিন ৭২/১২)।

সুহায়লী তাফসীরবিদগণের বরাতে বলেন, এই জিনগুলি ইহুদী ছিল। অতঃপর মুসলমান

হয়'। এদের বক্তব্য এসেছে সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে'। ২৫০৫ উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নবী ছিলেন। বরং তিনি সকল সৃষ্ট জীবের নবী ছিলেন। যেমন তিনি বলেন, আমাকে দিয়ে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'। অন্য হাদীছে সূরা সাবা ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন'। )

কারনুল মানাযিলে মালাকুল জিবালের আগমন ও তার বক্তব্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মন থেকে ত্বায়েফের সকল দুঃখ-বেদনা মুছে যায়। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে গিয়ে পূর্ণোদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করার সংকল্প করলেন। তখন যায়েদ বিন হারেছাহ )রাঃ) বললেন , যে মক্কাবাসীরা আপনাকে বের করে দিয়েছে, সেখানে আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন হে ,যায়েদ তুমি যে অবস্থা দেখছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ থেকে পরিত্রাণের একটা পথ বের করে দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন ও তার নবীকে বিজয়ী করবেন'।

কুরায়েশদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও সেখানে দাওয়াতের নতুন কেন্দ্র স্থাপনের আশা নিয়ে রাসূল (ছাঃ) এ সফর করেছিলেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত কবুল করেনি। বরং সেখান থেকে চরম নির্যাতিত হয়ে তাঁকে ফিরতে হয়।

তায়েফের দিনকে সর্বাধিক দুঃখময় দিন বলার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, ওহোদের ঘটনায় দান্দান মুবারক শহীদ হ'লেও সেদিন তাঁর সাথী মুজাহিদ ছিলেন অনেক, যারা তাঁর দাওয়াত চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু ওহোদের ঘটনার প্রায় ছয় বছর পূর্বেতায়েফের সেই মর্মান্তিক ঘটনার দিন তাঁর সাথী কেউ ছিল না যায়েদ বিন হারেছাহ ব্যতীত। অতএব তায়েফের ঘটনা ওহোদের ঘটনার চাইতে নিঃসন্দেহে অধিক কষ্টদায়ক ও অধিক হৃদয় বিদারক ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাখলা উপত্যকা হ'তে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করে হেরা গুহার পাদদেশে পৌঁছে মক্কায় প্রবেশের জন্য কিছু হিতাকাংখীর নিকটে খবর পাঠালেন। কিন্তু কেউ ঝুঁকি নিতে চায়নি। অবশেষে মুতু'ইম বিন 'আদী রাযী হন এবং তার সম্মতিক্রমে যায়েদ বিন হারেছাহকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় এসে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এ সময় মুত্ব'ইম ও তার পুত্র এবং কওমের লোকেরা সশস্ত্র অবস্থায় তাঁকে পাহারা দেন এবং পরে তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেন। আবু জাহল মুত্ব'ইমকে প্রশ্ন করেন 'আশ্রয়দাতা না অনুসারী'? মুতু'ইম জবাবে বলেন, 'বরং আশ্রয়দাতা'। তখন আবু জাহল বলেন, 'আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ'। মূলতঃ এটি ছিল বংশীয় টান মাত্র। এভাবে মাসাধিককালের কষ্টকর সফর শেষে ১০ম নববী বর্ষের যুলক্বা'দাহ মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিকে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুত্ব'ইম বিন 'আদীর এই সৌজন্যের কথা কখনো ভুলেননি। এই ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর সংঘটিত বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ) মুত্ব'ইম বিন 'আদী বেঁচে থাকত এবং এইসব দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য

সুফারিশ করত, তাহ'লে তার খাতিরে আমি এদের সবাইকে ছেড়ে দিতাম'। ২৬০ মুত্ব'ইম বিন 'আদী ৯০-এর অধিক বয়সে বদর যুদ্ধের পূর্বে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন (সিয়ারু আ'লাম ৩/৯৮)।

এই বছর ভিন দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ওমরাহ করার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন এবং শেষনবী আবির্ভাবের সংবাদ শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যারা এ সময় ইসলাম কবুল করে ধন্য হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ইয়াছরিবের আউস গোত্রের বিখ্যাত কবি ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ও 'কামিল' লকবধারী সুওয়াইদ বিন ছামেত, একই গোত্রের ইয়াস বিন মু'আয, ইয়াছরিবের বিখ্যাত 'গেফার' গোত্রের আবু যার গেফারী, ইয়ামনের যেমাদ আযদী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ'। এই সকল ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব এলাকায় ইসলামের বাণী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে দলে দলে লোক ইসলাম কবুল করে।

. **সুওয়াইদ বিন ছামেত** : ১১ নববী বর্ষে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু ফিরে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি নিহত হন। সেকারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করলেও ইবনু হাজার বলেন, যদি তাদের বক্তব্য সঠিক হ'ত, তবে তাঁকে ছাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হ'ত না (আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ৩৮২২)।

**ইয়াস বিন মু'আয** : ইনি আবুল জালীস আনাস বিন রাফে' এবং বনু আব্দিল আশহালের কতিপয় যুবকের সাথে মক্কায় আসেন। আউস গোত্রের এ দলটি আগমনের উদ্দেশ্য ছিল খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়েশদের মিত্রতা ও সহায়তা লাভকরা। তাদের আগমনের খবর পেয়ে রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট গিয়ে বললেন, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তার চাইতে উত্তম বস্তু গ্রহণ করবেন কি? তারা বলল, সেটা কি? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার বান্দাদের নিকটে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন তাদেরকে দাওয়াত দেই এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন'। এসময় যুবক ইয়াস

বিন মু'আয বলে উঠলেন, হে আমার সাথীরা! আল্লাহ্র কসম আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি এটাতো তার চেয়ে অনেক উত্তম। তখন আনাস বিন রাফে' এক মুষ্টি কংকর নিয়ে ইয়াসের মুখে মারল। তারপর রাসূল (ছাঃ) উঠে গেলেন এবং তারা ইয়াছরিবে ফিরে গেল। এর কিছুদিন পরইয়াস মৃত্যুবরণ করেন। রাবী বলেন, মৃত্যুর সময় তিনি তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদে রত ছিলেন। সেকারণ ইসলামের উপর তার মৃত্যু হয়েছিল বলে অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন' (আহমাদ হা/২৩৬৬৮, সনদ হাসান)।

**আবু যর গিফারী** : তাঁর ইসলাম কবুলের ঘটনা তাঁর যবানীতেই জানা যায়। তিনি বলেন, আমরা জানতে পারলাম যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর নিয়ে এলে? সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও এক থলি খাবার নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হ'লাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি তাকে চিনতেও পারলাম না বা কারু কাছে তার কথা জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে থাকতে লাগলাম।

একদিন সন্ধ্যায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। তখন আমি তার সাথে তার বাড়িতে চললাম। পথে তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আমিও ইচ্ছা করে কিছু বলিনি। অতঃপর তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোরবেলায় আবার মসজিদে এলাম ঐ ব্যক্তির খোঁজ নেওয়ার জন্য। কিন্তু ওখানে এমন কোন লোক ছিল না যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। তিনি বলেন, ঐদিনও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চলুন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো আপনার উদ্দেশ্য কি? কিজন্য এ শহরে এসেছেন? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখার আশ্বাস

দেন, তাহ'লে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি গোপন রাখব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি যে, এখানে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিরে গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে এসেছি। আলী (রাঃ) বললেন, আপনি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছেন। আমি এখনই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হচ্ছি। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করব আপনিও সে গৃহে প্রবেশ করবেন। রাস্তায় যদি আপনার জন্য বিপজ্জনক কোন লোক দেখতে পাই, তাহ'লে আমি জুতা ঠিক করার অজুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করছি। আর আপনি চলতেই থাকবেন। অতঃপর আলী (রাঃ) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিওতাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে আমিও তাঁর পিছে পিছে প্রবেশ করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। ফলে আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবূ যর! এখনকার মত তোমার ইসলাম গোপন রেখে দেশে ফিরে যাও। অতঃপর যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পারবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি কাফির-মুশরিকদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করব'।

রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ কথা বলে তিনি মাসজিদুল হারামে গমন করলেন। কুরাইশের লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে কুরায়েশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'। এ কথা শুনেই কুরায়েশরা বলে উঠল, ধর এই 'ছাবেঈ' (ধর্মত্যাগী)-টাকে। তারা আমার দিকে তেড়ে এল এবং আমাকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল, যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট পৌঁছে আমাকে ঘিরে রাখলেন এবং কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! তোমরা গিফার গোত্রের লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ? অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলা গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে থাকে?

এ কথা শুনে তারা আমার থেকে সটকে পড়ল। পরদিন ভোরে কা'বাগৃহে উপস্থিত হয়ে আগের দিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিলাম। কুরায়েশরা গতকালের মত আজও আমাকে মারধর করল। এ দিনও আব্বাস (রাঃ) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে গতকালের মত বক্তব্য রাখলেন। রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল আবু যর গেফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা'। পরবর্তীতে বদর ও ওহোদ যুদ্ধ শেষে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং মদীনায় থেকে যান)। তিনি আছহাবে ডুফফার অন্তর্ভুক্ত হন

**যেমাদ আযদী :** ইয়ামনের অধিবাসী যেমাদ আযদী ছিলেন ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে জিন ছাড়ানো চিকিৎসক। মক্কাবাসীদের নিকট সবকিছু শুনে তিনি রাসূল )ছাঃ)-কে জিনে ধরা রোগী মনে করে তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, ي এই ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা আরোগ্য দান করে থাকেন। অতএব আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?' জবাবেরাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে শুনিয়ে দেন খুৎবাতুল হাজতের সেই অমৃত বাণী সমূহ- যা প্রতিটি খুৎবা ও বক্তৃতার সূচনায় আবৃত্তি করা পরবর্তীতে সুন্নাতে পরিণত হয়। বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ:

:

'নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল'।

যেমাদ কথাগুলি শুনে গদগদ চিত্তে রাসূল (ছাঃ)-কে বারবার কথাগুলি বলতে অনুরোধ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাগুলি তিনবার বলেন। অতঃপর যেমাদ বলে উঠলেন

জাদুকরদের ও কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার উক্ত কথাগুলির মত কারুর কাছে শুনিনি। এগুলি সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গেছে। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন! আমি আপনার নিকটে ইসলামের উপরে বায়'আত করব'। অতঃপর তিনি বায়'আত করেন।

## আক্বাবার বায়'আত

একাদশ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুম (জুলাই ৬২০ খ্রিঃ)। দিনের বেলায় আবু লাহাব ও অন্যান্যদের পিছু লাগা ও পদে পদে অপদস্থ হবার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির গভীরে দাওয়াতে বের হওয়ার মনস্থ করেন। সেমতে তিনি একরাতে আবুবকর ও আলীকে সাথে নিয়ে বহিরাগত বিভিন্ন হজ্জ কাফেলার লোকদের সঙ্গে তাদের তাঁবুতে বা বাইরে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। এমন সময় তাঁরা মিনার আক্বাবাহ গিরিসংকটের আলো-আঁধারীর মধ্যে কিছু লোকের কথাবার্তা শুনে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে, তারা ইয়াছরিব থেকে হজ্জে এসেছেন এবং তারা ইহুদীদের মিত্র খাযরাজ গোত্রের লোক। তারা ছিলেন সংখ্যায় ছয়জন এবং সকলেই ছিলেন তরতাযা তরুণ। তারা ছিলেন ইয়াছরিবের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় যুবকদের শীর্ষস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। অতঃপর তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তারা ইতিপূর্বে ইহুদীদের নিকটে শুনেছিল যে, সত্বর আখেরী নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা বলত, যামানা নিকটবর্তী হয়েছে। এখন একজন নবী আগমন করবেন, যার সাথে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব 'আদ ও ইরাম জাতির ন্যায়' (অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব)। তারা এভাবেই আমাদের হুমকি দিত। ফলে ইনিই যে সেই নবী, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়ে তখনই ইসলাম কবুল করল।

অতঃপর তারা বলল, দু'বছর পূর্বে সমাপ্ত বু'আছ যুদ্ধের ফলে ইয়াছরিববাসীগণ পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। পারস্পরিক হানাহানি ও শত্রুতার ফলে তাদের সমাজে এখন অশান্তির আগুন জ্বলছে। অতএব এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি ইয়াছরিবে হিজরত করেন,

তবে তাঁর আহ্বানে সেখানে শান্তি স্থাপিত হ'তে পারে এবং আউস ও খাযরাজ উভয় দল তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে। ফলে তাঁর চাইতে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে আর কেউ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দাওয়াত শুনলেন এবং তাদেরকে ফিরে গিয়ে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে বললেন (যাতে হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়)।

উপরোক্ত সৌভাগ্যবান ৬ জন খাযরাজী যুবনেতা ছিলেন- আব্দুল মুত্তালিবের মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জার গোত্রের আস'আদ বিন ঘুরারাহ। ইনি ছিলেনকনিষ্ঠতম। কিন্তু ইনিই ছিলেন তাদের নেতা। (২) একই গোত্রের 'আওফ বিন হারেছ

)৩) বনু যুরায়েকু গোত্রের রাফে' বিন বিন রেফা'আহ মালেক বিন আজলান )৪) বনু সালামাহ গোত্রের কুৎত্বা

বিন 'আমের বিন হাদীদাহ )৫) বনু হারাম গোত্রের ওকুবা বিন 'আমের বিন নাবী )৬) বন্ধু ওবায়েদ বিন গানাম গোত্রের জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব )রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)।২৯

উক্ত ৬ জন তরুণের দাওয়াতই মদীনায় হিজরতের বীজ বপন করে। যা মাত্র তিন বছরের মাথায় গিয়ে বাস্তব ফল দান করে। এটি স্রেফ ইসলাম কবুলের সাধারণ বায়'আত ছিল। এতে কোন শর্ত বা কোন বিশেষ নির্দেশনা ছিলনা বিধায় জীবনীকারগণ এটিকে বায়'আত হিসাবে গণনা করেননি। যদিও এটাই ছিল প্রথম বায়'আত এবং পরবর্তী দু'টি বায়'আতের ভিত্তি।

গত বছর হজ্জের মওসুমে ইসলাম কবুলকারী ৬ জন যুবকের প্রচারের ফলে পরের বছর নতুন সাত জনকে নিয়ে মোট ১২ জন ব্যক্তি হজ্জে আসেন। গতবারের জাবের বিন আব্দুল্লাহ এবার আসেননি। দ্বাদশ নববী বর্ষের যিলহজ্জ মাসের (মোতাবেক জুলাই ৬২১ খৃঃ) এক গভীর রাতে মিনার পূর্ব নির্ধারিত আক্বাবাহ নামক স্থানে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই স্থানটিকে এখন জামরায়ে আক্বাবাহ বা বড়

জামরাহ বলা হয়। মিনার পশ্চিম দিকের এই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াত করতে হ'ত। এই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথকেই 'আক্বাবাহ' বলা হয়।

বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে মাদানী জীবনে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বীজ বপন সমতুল্য। এই বায়'আত ছিল মহিলাদের বায়'আতের ন্যায়। যা তাদের উপর যুদ্ধ ফরয হওয়ার পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিল (ইবনু হিশাম ১/৪৩১)।

এই বায়'আতে গত বছরের পাঁচজন ছাড়াও এ বছর নতুন যে সাতজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হ'লেন: (১) বনু নাজ্জার গোত্রের মু'আয বিন হারেছ বিন রিফা'আহ  )২) বনু যুরায়েকু গোত্রের যাকওয়ান ইবনু 'আব্দে কায়েস )৩) বনু গানাম গোত্রের 'উবাদাহ বিন ছামেত )৪) (( বনু গানামের মিত্র গোত্রের ইয়াযীদ বিন ছা'লাবাহ )( )৫) বনু সালেম গোত্রের আব্বাস বিন ওবাদাহ বিন নাযালাহ )3) (( 'আব্দিল আশহাল গোত্রের আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান )৭) বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রের 'ওয়ায়েম বিন সা'এদাহ

) শেষোক্ত দু'জন ছিলেন আউস বংশের এবং বাকীগণ ছিলেন খাযরাজ বংশের। তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত'

অত্র বায়'আতে অংশগ্রহণকারী ছাহাবী 'উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বললেন যে, তোমরা এসো আমার নিকটে বায়'আত কর এই মর্মে যে, (১) তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না (২) চুরি করবে না (৩) যেনা করবে না (৪) নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না (৫) কাউকে মনগড়া অপবাদ দিবে না (৬) সঙ্গত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এগুলি পর্ণ করবে আল্লাহর নিকটে তারকোনটি করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহ'লে সেটি তার জন্য কাফফারা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ এগুলির কোনটি করে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপরেই ন্যস্ত থাকবে। চাইলে তিনি বদলা নিবেন, চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন'। রাবী 'উবাদাহ বিন ছামেত বলেন, অতঃপর আমরা উক্ত কথাগুলির উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট

বায়'আত করলাম'। ইতিহাসে এটাই আবাবার প্রথম বায়'আত বা 'আক্বাবায়ে উলা হিসাবে পরিচিত। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল ২য় বায়'আত।

(১) বায়'আতে বর্ণিত ছয়টি বিষয়ের প্রতিটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি শুধু সেযুগেই নয়, বরং সর্বযুগেই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণিত বিষয়গুলি সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করলে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট হয়। জাহেলী আরবে এগুলি বিনষ্ট হয়েছিল বলেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। আজকালকের কথিত সভ্য দুনিয়ায় এগুলি প্রকট আকারে বিদ্যমান। আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যা ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। অতএব দুনিয়াপূজারী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আখেরাতমুখী করার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাগণ আল্লাহর নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে ও রাষ্ট্রে কাংখিত শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

২) বায়'আত (অর্থ অঙ্গীকার। ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

অঙ্গীকারকে বায়'আত এজন্য বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে যেমন সম্পদ লাভ হয়, আমীরের নিকটে বায়'আতের মাধ্যমে আনুগত্যের বিপরীতে তেমনি পুণ্য লাভহয়। সে যেন আমীরের নিকটে তার খালেছ হৃদয় ও আনুগত্য বিক্রয় করে দেয়।

## ঈসরা ও মিরাজ

ইসরা' অর্থ নৈশ ভ্রমণ এবং 'মি'রাজ' অর্থ সিঁড়ি। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ পর্যন্ত বোরাক্কের সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বল্পকালীন নৈশ ভ্রমণকে 'ইসরা' )( বলা হয় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বমুখী সিড়ির মাধ্যমে মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকে মে'রাজ )( বলা

হয়। নববী জীবনে এটি ছিল এক অলৌকিক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। যার মাধ্যমে শেষনবীকে পরকালীন জীবনের সবকিছু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করানো হয়। এর ফলে তাঁর মধ্যে যেমন বিশ্বাস ও প্রতীতি দৃঢ়তর হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি জন্মে, তেমনি মুমিন হৃদয়ে পরকালীন মুক্তির জন্য উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। ভবিষ্যৎ মাদানী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতসংকুল জিহাদী যিন্দেগীতে যে দৃঢ় বিশ্বাস-এর প্রয়োজন হবে অত্যন্ত বেশী। সেকারণ অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য হিজরতের পূর্বেই আল্লাহ তাঁর নবীকে মে'রাজের মাধ্যমে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেন। যাতে তা মাদানী জীবনে ইসলামী বিজয়ে সহায়ক হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতে 'ইসরা' এবং সূরা নজমের ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত ৬ আয়াতে মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বাকী বিশদ ঘটনাবলী ছহীহ হাদীছ সমূহে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بَعَبْدَه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ - السَّمِيعُ البَصير 'পরম পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রির একাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম থেকে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল আকুছা পর্যন্ত। যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি। যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (ইসরা ১৭/১)।

উক্ত আয়াতে চারটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। ১. ইসরা ও মি'রাজের পুরা ঘটনাটি রাতের শেষাংশে স্বল্প সময়ে একবার মাত্র সম্পন্ন হয়েছিল, যা ১১ শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে।

২. ঘটনাটি জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঘটেছিল, যা শব্দের মাধ্যমে বলা হয়েছে। কেননা রূহ ও দেহের সমন্বিত সত্তাকে 'আব্দ' বা দাস বলা হয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে বা রূহানী কোন ব্যাপার হ'লে কেউ একে অবিশ্বাস করত না এবং কুরআনে তাঁকে 'আব্দ' না বলে হয়তবা 'রূহ' )( বলা হ'ত। এখানে ১১ 'তাঁর দাস' বলে রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র দাস হওয়ার মধ্যেই মানুষের সর্বোচ্চ সম্মান নিহিত রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,এটি ছিল প্রত্যক্ষ দর্শন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখানো হয়েছিল'

উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ঘোড়া বা উটে যাতায়াতে দু'মাসের পথ। যা এক রাতেই ভ্রমণ করে মি'রাজ থেকে ফিরে এসে সকাল বেলা যখন রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) লোকদের কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন সবাই একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। অবশেষে যারা ইতিপূর্বে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণ করেছেন, এমন কিছু অভিজ্ঞ লোক তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পেয়ে তারা চুপ হ'ল বটে। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসী অন্তর প্রশান্ত হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত আবুবকর  রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন এর চাইতে অনেক বড় বিষয়ে সত্য বলে জানি। আমি সকালে ও সন্ধ্যায় তার নিকটে আগত আসমানী খবরসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি'। এ দিন থেকেই তিনি 'ছিদ্দীকু' )( বা সর্বাধিক সত্যবাদী নামে অভিহিত হ'তে থাকেন'।

এটি অত্যন্ত বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল। সেকারণ শুরুতে বিস্ময়সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাপার হ'লে তো এটা মোটেই আশ্চর্যজনক হ'ত না এবং একদল দুর্বল ঈমানদার ইসলাম ত্যাগ করে চলে যেত না। এজন্যই আল্লাহ এটাকে 'মানুষের জন্য ফিৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ' ) ( বলেছেন অর্থাৎ উক্ত ঘটনায় নও মুসলিমদের মুরতাদ হয়ে যাবার ফিৎনা। যেমন অনেকে হয়েছিল।

৩. বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশপাশ ভূমি অর্থাৎ ফিলিস্তীন সহ পুরা সিরিয়া অঞ্চল বরকতময় এলাকা, যা বাক্যাংশের মাধ্যমে বলা হয়েছে। এখানে আধ্যাত্মিক বরকত হ'ল এই যে, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবীর আবাসভূমি হ'ল এই এলাকা। আর দুনিয়াবী বরকত এই যে, শাম এলাকার মাটি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সবচেয়ে উর্বর ও সুজলা-সুফলা। এতদ্ব্যতীত এ অঞ্চলের অন্যান্য বরকত সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে পরজগতের অলৌকিক নিদর্শন সমূহের কিছু অংশ স্বচক্ষে দেখিয়ে দেন। যা বাক্যাংশের মাধ্যমে বলা হয়েছে। উক্ত নিদর্শন সমূহের মধ্যে ছিল যা ছহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যেমন (১) মক্কা থেকে বোরাকে সওয়ার হওয়ার পূর্বে সীনা চাকু করা এবং তা যমযম পানি দিয়ে ধুয়ে সেখানে নূর দিয়ে ভরে দেওয়া। অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস গিয়ে সেখান থেকে ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে তাঁকে দুধ ও মদ পরিবেশন করা। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) দুধ গ্রহণ করেন। তখন জিব্রীল বলেন, 'আপনি

স্বভাবধর্ম প্রাপ্ত হয়েছেন'। (২) তিনি প্রথম আসমানে আদম, দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে ইদরীস, পঞ্চম আসমানে হারূণ, ষষ্ঠ আসমানে মূসা এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম ('আলাইহিমুস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তবে আদম ও ইবরাহীম (আঃ) ব্যতীত অন্যদের আসমানের ব্যাপারে বর্ণনাগত ভিন্নতা রয়েছে। (৩) তিনি ফেরেশতাদের কলম দিয়ে লেখার খসখস আওয়ায শোনেন। (৪) ছয়শো ডানাবিশিষ্ট জিব্রীলকে তার নিজস্ব রূপে নিকট থেকে দেখেন। (৫) সিদরাতুল মুনতাহার কুলগাছ দেখেন। যার পাতাগুলি হাতির কানের মত বড় বড়। (৬) সপ্তম আসমানে বায়তুল মা'মূর মসজিদ দেখেন। যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাযার ফেরেশতা ছালাত আদায় করে। কিন্তু পুনরায় আর সুযোগ পায় না। (৭) হাউয কাওছার, জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। তিনি জান্নাতের নে'মতরাজি ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। (৮) তাঁকে তাঁর জন্য নির্ধারিত সুফারিশের স্থান 'মাক্কামে মাহমূদ' দেখানো হয়। (৯) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলে চারদিকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আল্লাহ তাঁর সাথে সরাসরি অহি-র মাধ্যমে কথা বলেন। অতঃপর তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। পরে মূসার পরামর্শক্রমে তাঁর বারবার যাতায়াত ও উপর্যুপরি অনুরোধে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। যা পঞ্চাশ ওয়াক্তের নেকীর সমান। (১০) তিনি সরাসরি আল্লাহকে দেখেননি, তাঁর নূর দেখেছিলেন। (১১) অতঃপর তিনি নেমে আসেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে নবীগণের ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বোরাকে চড়ে রাত্রি কিছু বাকী থাকতেই মক্কায় মাসজিদুল হারামে ফিরে আসেন (তাফসীর ইবনু কাছীর)। পুরা ঘটনাটিই ঘটে অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে। যা ছিল মানবীয় জ্ঞানের বহির্ভূত। অথচ বাস্তব সত্য। যা মক্কার মুশরিক ও শত্রুনেতাদের দ্বারা সত্যায়িত।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য নবীদেরকেও আল্লাহ তাঁর কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়েছেন। তবে সেগুলি সব দুনিয়াতেই দেখানো হয়েছিল। যেমন ইবরাহীম (আঃ) চারটি পাখি যবহ ও টুকরা টুকরা করে মিশ্রিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চারটি পাহাড়ে রেখে এসে বিসমিল্লাহ বলে ডাক দিতেই তাদের স্ব স্ব দেহে পুনর্জীবিত হওয়া, অতঃপর তাঁর কাছে চলে আসা (বাকারাহ ২/২৬০); তাঁর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ড শান্তিময় স্থানে পরিণত হওয়া। কেন'আন থেকে মিসর যাওয়ার পথে অপহৃত স্ত্রী সারাহ-এর উপরে যালেম বাদশাহর হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া (বুখারী হা/২২১৭: আহমাদ হা/৯২৩০) ইত্যাদি অলৌকিক

ঘটনাবলী। অন্যদিকে মূসা (আঃ)-এর আল্লাহর সাথে পবিত্র তুবা উপত্যকায় কথোপকথন ও তুর পাহাড়ে তাঁর জ্যোতি প্রদর্শন (আ'রাফ ৭/১৪৩), অলৌকিক লাঠির মাধ্যমে নদী বিভক্ত হওয়া ও ফেরাউন বাহিনী ডুবে মরা (শো'আরা ২৬/৬৩-৬৬), নিজ গোত্রের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এলাহী গযবে মৃত্যুবরণ ও পরক্ষণেই মূসা (ছাঃ)-এর দো'আয় ও আল্লাহর হুকুমে পুনরায় জীবিত হওয়া (বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬) ইত্যাদি ঘটনাবলী।

ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وكذلك نري إبراهيم مَلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِين আসমান ও যমীনের রাজত্ব প্রদর্শন করেছি। যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়' (আন'আম ৬/৭৫)। অনুরূপভাবে মূসা (আঃ)-কে দেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, দেখাতে পারি' (ত্বোয়াহা ২০/২৩)। সবশেষে শেষনবী (ছাঃ)-কে সপ্তাকাশের উপরে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আল্লাহ তাঁকে পরজগতের অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করালেন এবং বললেন, 'এটা এজন্য, যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাই' এভাবে মে'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ শেষনবীর মধ্যে 'আয়নুল ইয়াক্বীন' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। যা অন্য কোন নবীর বেলায় করেননি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দলীল। সেই সাথে এটি ছিল বিশ্বাসীদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। যেমন আল্লাহ বলেন,

'...আর আমরা তোমাকে (মে'রাজের রাতে) যে দৃশ্য দেখিয়েছি এবং কুরআনে বর্ণিত যে অভিশপ্ত (যাকুম) বৃক্ষ দেখিয়েছি, তা ছিল কেবল মানুষের (ঈমান) পরীক্ষার জন্য। আমরা তাদের ভীতি প্রদর্শন করি। অতঃপর এটা তাদের বড় ধরনের অবাধ্যতাই কেবল বৃদ্ধি করে' (ইসরা ১৭/৬০)।

মে'রাজের তারিখ )( : এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে ছয় প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যথা- (১) ১ নববী বর্ষেই মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (২) ৫ নববী বর্ষে (৩) ১০ নববী বর্ষের ২৭শে রজব তারিখে (৪) ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে (৫) ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে (৬) ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে।উপরোক্ত ছয়টি মতামতের মধ্যে প্রথম চারটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তৃতীয় মতটিই উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। কারণ, এ ব্যাপারে সকল বিধান একমত যে, উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা

(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটাও সকল বিদ্বান কর্তৃক স্বীকৃত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১০ নববী বর্ষের রামাযান মাসে। অতএব মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে একথা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। এক্ষণে শেষের তিনটি মতামতের মধ্যে কোনটিতেই নিশ্চিত হবার উপায় নেই। তবে সূরা ইসরার শুরুতে মে'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনার পরপরই বনু ইস্রাঈলের অধঃপতন সম্পর্কিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানী বিশ্বে বনু ইস্রাঈলের দীর্ঘ নেতৃত্বের অবসান এবং মুহাম্মাদী নেতৃত্বের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে। অর্থাৎ হিজরতের প্রাক্কালে মাক্কী জীবনের শেষপ্রান্তে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। যা ১৩ নববী বর্ষের যেকোন এক রাতে হয়েছিল বলে একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অতঃপর হিজরত শুরু হয়েছিল ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার।

মে'রাজের সঠিক তারিখ উম্মতের নিকটে অস্পষ্ট রাখার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, তারা যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত উম্মতগুলির ন্যায় অনুষ্ঠানসর্বস্ব না হয়ে পড়ে। বরং মে'রাজের তাৎপর্য অনুধাবন করে আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। অতঃপর মে'রাজের অমূল্য তোহফা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে গভীর অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বদা আল্লাহ্ আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করে।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে মক্কা থেকেই সরাসরি মে'রাজ করাতে পারতেন। কিন্তু মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নিয়ে এসে সেখান থেকে মে'রাজ করানোর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবরাহীমী দাওয়াতের দু'টি প্রধান কেন্দ্র কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাস দুই স্থানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব এখন থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের উপরেই ন্যস্ত করা হবে। যা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরী সনে সম্পন্ন হয় এবং যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। যদিও পাশ্চাত্য বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য বাহির থেকে ইহুদীদের এনে ফিলিস্তীনের একাংশ থেকে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানদের বের করে দিয়েছে এবং সেখানে ইহুদীদের যবরদস্তি বসিয়ে দিয়ে তাকে 'ইস্রাঈল রাষ্ট্র' নাম দিয়েছে ১৯৪৮ সালে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অস্থায়ী বিষয়। যার সত্বর অবসান হবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব ইসলামী দাওয়াতের প্রথম পর্যায় মাক্কী জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ইয়াছরিবে হিজরতের প্রাক্কালে মে'রাজ হয়েছিল বলা চলে। অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ নববী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত ১ম ও ২য় বায়'আত অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী কোন এক রজনীতে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

অতএব মে'রাজ ছিল ইসলামী বিজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং মাদানী জীবনের নব সূচনা

## ইয়াসরীবে হিজরত

দ্বাদশ নববী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত আক্বাবাহর ২য় বায়'আতে অংশগ্রহণকারী ১২ জন মুসলমানের সাথে পরের বছর যিলহাজ্জ মাসে (জুন ৬২২ খৃঃ) অনুষ্ঠিত আক্বাবাহর ৩য় বায়'আতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাসহ মোট ৭৫ জন ইয়াছরিববাসী হজ্জে এসে বায়'আত গ্রহণ করেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বায়'আতে কুবরা ) ( বা বড় বায়'আত নামে খ্যাত। যা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এবং আগামীতে ঘটিতব্য ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সূচনাকারী। এই সময় মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ইয়াছরিবে দাওয়াতের অবস্থা ও গোত্র সমূহের ইসলাম কবুলের সুসংবাদ প্রদান করেন। যা রাসূল (ছাঃ)-কে হিজরতে উদ্বুদ্ধ করে।

মূলতঃ আক্বাবার বায়'আত তিন বছরে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। ১১ নববী বর্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ্ নেতৃত্বে ৬ জন ইয়াছরিববাসীর প্রথম ইসলাম কবুলের বায়'আত। ১২ নববী বর্ষে ১২ জনের দ্বিতীয় বায়'আত এবং ১৩ নববী বর্ষে ৭৩+২=৭৫ জনের তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ বায়'আত- যার মাত্র ৭৫ দিনের মাথায় ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার মক্কা হ'তে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের সূচনা হয়।

বিবরণ: ১২ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হ'লে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় পূর্বোক্ত ৭৫ জন ইয়াছরেবী

হাজী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাতের জন্য বের হন এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্বাবাহ্ সুড়ঙ্গ পথে অতি সঙ্গোপনে হাযির হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হন, যিনি তখনও প্রকাশ্যে মুসলমান হননি। তবে তিনি কখনও রাসূল (ছাঃ)-কে একা ছাড়তেন না।

কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রথমে আব্বাস কথা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ আমাদের মাঝে কিভাবে আছেন তোমরা জানো। তাকে আমরা আমাদের কওমের শত্রুতা থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং তিনি ইযযতের সাথে তার শহরে বসবাস করছেন। এক্ষণে তিনি তোমাদের ওখানে হিজরত করতে ইচ্ছুক। এ অবস্থায় তোমরা তার পূর্ণ যিম্মাদারীর অঙ্গীকার করলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এমনটি হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে, অতঃপর বিপদ মুহূর্তে তাকে পরিত্যাগ করলে, তাহ'লে তোমরা তাকে নিয়ে যেয়ো না। তিনি আমাদের মধ্যে সসম্মানেই আছেন'।

আব্বাসের বক্তব্যের পর প্রতিনিধি দলের মধ্য থেকে কা'ব বিন মালেক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আব্বাসের কথা শুনেছি। এক্ষণে

'আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের জন্য ও নিজ প্রশাসন্য যেচুক্তি আপনি ইচ্ছা করেন, তা করে নিন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে কুরআন থেকে

কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন। অতঃপর তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানান।

'আমি তোমাদের বায়'আত নেব এ বিষয়ের উপর যে, তোমরা আমাকে হেফাযত করবে

ঐসব বিষয় থেকে, যেসব বিষয় থেকে তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদেরকে

হেফাযত করে থাক'। সাথে সাথে বারা বিন মা'রূর রাসূল (ছাঃ)-এর হাত ধরে বললেন,

আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই আমরা আপনাকে হেফাযত করব এসব বিষয় থেকে, যা থেকে আমরা আমাদের মা-বোনদের হেফাযত করে থাকি'। এ সময় আবুল হায়ছাম ইবনুত তাইয়েহান বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সঙ্গে ইহুদীদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। আমরা তা ছিন্ন করছি। কিন্তু এমন তো হবে না যে, আমরা এরূপ করে ফেলি। তারপর আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন আপনি আবার আপনার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবেন ও আমাদের পরিত্যাগ করবেন'?

জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হেসে বললেন,

! রক্ত, তোমাদের ইযযত আমার ইযযত। আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আমার থেকে। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব'। এরপর সবাই যখন বায়'আত গ্রহণের জন্য এগিয়ে এল, তখন আব্বাস বিন ওবাদাহ বিন নাযালাহ (যিনি গত বছর বায়'আত করেছিলেন,) সকলের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে নিজের গোত্র খাযরাজদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা কি জানো কোন কথার উপরে তোমরা এই মানুষটির নিকটে বায়'আত করছ? সবাই বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা লাল ও কালো (আযাদ ও গোলাম) মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর নিকটে বায়'আত করতে যাচ্ছ। যদি তোমাদের এরূপ ধারণা থাকে যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করা হবে, তখন তোমরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাবে, তাহ'লে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পরে যদি তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ কর, তাহ'লে ইহকাল ওপরকালে চরম লজ্জার বিষয়

হবে। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে যে, তোমাদের মাল-সম্পদের ধ্বংস ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা সত্ত্বেও এ চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবে, যার প্রতি তোমরা তাঁকে আহ্বান করছ, তাহ'লে অবশ্যই তা সম্পাদন করবে। কেননা আল্লাহর কসম! এতেই তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে')।

আব্বাস বিন ওবাদাহর এই ওজস্বিনী ভাষণ শোনার পর সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে, ' তাঁকে গ্রহণ করছি আমাদের মাল-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যার বিনিময়ে। কিন্তু যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি, তবে এর বদলায় আমাদের কি পুরস্কার রয়েছে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, জান্নাত। তারা বলল, হাত বাড়িয়ে দিন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তারা সবাই তাঁর হাতে বায়'আত করল' । অন্য বর্ণনায় এসেছ 'ব্যবসা চুক্তি লাভজনক হয়েছে। আমরা কখনো তা রহিত করব না বা রহিত করার আবেদন করব না'।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, লোকেরা বলে উঠল, 'আল্লাহ্র কসম! আমরা এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং রহিত করার আবেদন করব না'। একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং তা বাতিল করব না'

এ সময় দলনেতা এবং কাফেলার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আস'আদ বিন যুরারাহ পূর্বের বক্তার ন্যায় কথা বললেন এবং পূর্বের ন্যায় সকলে পুনরায় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর তিনিই প্রথম বায়'আত করলেন। এরপর একের পর এক সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।

আব্বাস উক্ত আনছার প্রতিনিধি দলের প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখেন এবং বলেন যে, 'এরা সবাই তরুণ বয়সের। এদেরকে আমি চিনিনা'। এতে প্রমাণিত হয় যে, উক্তদলে যুবকদের আধিক্য ছিল। প্রতিনিধি দলের মহিলা দু'জনের বায়'আত হয় মৌখিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে। সৌভাগ্যবতী এই মহিলা দু'জন হ'লেন বনু মাযেন গোত্রের উম্মে 'উমারাহ নুসাইবা বিনতে কা'ব )( এবং বনু সালামাহ গোত্রের উম্মে মানী' আসমা বিনতে আমর উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) এই বায়'আতকে 'বায়'আতুল

হারব' বা যুদ্ধের বায়'আত বলে অভিহিত করেন। ২৮১ কা'ব বিন মালেকের বর্ণনায় এসেছে যে, প্রথম বায়'আত করেন বারা বিন মা'রূর। বনু আব্দিল আশহাল বলতো প্রথম বায়'আতকারী ছিলেন তাদের গোত্রের আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান। ২৮২ অবশ্য বনু নাজ্জার ধারণা করত যে, তাদের গোত্রের আস'আদই প্রথম বায়'আত করেন' (ইবনু হিশাম ১/৪৪৭)। আর দলনেতা ও প্রথম দাঈ হিসাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আবেগের বসে কেউ আগে বায়'আত করলে সেটাও অসম্ভব নয়।

'জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন কথার উপরে আপনার নিকটে বায়'আত করব? তিনি বললেন, (১) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও তা মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহর রাস্ত ায়) খরচ করবে (৩) সর্বদা ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহ্ জন্য কথা বলবে এভাবে যে, আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি ইয়াছরিবে তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের ও নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করে থাক, সেভাবে আমাকে হেফাযত করবে।

বায়'আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্যাতিত মুসলমানদের ইয়াছরিবে
হিজরতের অনুমতি দিলেন। এই হিজরত অর্থ স্রেফ দ্বীন ও প্রাণ রক্ষার্থে সর্বস্ব ছেড়ে দেশত্যাগ করা। কিন্তু এই হিজরত মোটেই সহজ ছিল না। মুশরিক নেতারা উক্ত হিজরতে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইতিপূর্বে তারা হাবশায় হিজরতে বাধা দিয়েছিল। এখন তারা ইয়াছরিবে হিজরতে বাধা দিতে থাকল। ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক কারণ ছিল এই যে, মক্কা থেকে ইয়াছরিব হয়ে সিরিয়ায় তাদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা পরিচালিত হ'ত। আর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এই যে, ইয়াছরিবে মুহাজিরগণের অবস্থান সুদৃঢ় হ'লে এবং ইয়াছরিববাসীগণ ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিলে তা মক্কার

মুশরিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। যা মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। যাতে তাদের জান-মাল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু হুমকির মধ্যে পড়বে।

এভাবে আল্লাহ এমন এক স্থানে নির্যাতিত মুসলমানদের হিজরতের ব্যবস্থা করলেন, যা ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সব দিক বিবেচনা করে কুরায়েশ নেতারা হিজরত বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন এবং সম্ভাব্য হিজরতকারী নারী-পুরুষের উপরে যুলুম ও অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেন। যাতে তারা ভীত হয় ও হিজরতের সংকল্প ত্যাগ করে।

বারা বিন 'আযেব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট প্রথম হিজরত করে আসেন মুছ'আব বিন উমায়ের, অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ ছাহাবী)। তারা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতঃপর আগমন করেন বেলাল, সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ ও 'আম্মার বিন ইয়াসির। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আসেন বিশজন সাথী নিয়ে। অতঃপর আগমন করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং। ২৯০ নিম্নে হিজরতের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল:

১) আবু সালামাহ মাখযূমী : ইনি ছিলেন মদীনায় প্রথম হিজরতকারী ছাহাবী। ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে বায়'আতে কুবরার বছর খানেক পূর্বে কোলের পুত্র সন্তানসহ স্ত্রী উম্মে সালামাহকে নিয়ে হিজরত করেন। কিন্তু মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ারপর পথিমধ্যে আবু সালামাহ্র গোত্রের লোকেরা এসে তাদের বংশধর দাবী করে শিশুপুত্র সালামাহকে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর উম্মে সালামার পিতৃপক্ষের লোকেরা এসে তাদের মেয়েকে জোর করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। ফলে আবু সালামাহ স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে একাকী ইয়াছরিবে হিজরত করেন। এদিকে বিচ্ছেদকাতর উম্মে সালামাহ প্রতিদিন সকালে স্বামী ও সন্তান হারানোর সেই 'আবত্বাহ' )( নামক স্থানটিতে এসে কান্নাকাটি করেন ও আল্লাহর কাছে দো'আ করেন। অতঃপর সন্ধ্যায় ফিরে যান। এভাবে প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির মধ্যে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি সবাইকে বলে রাযী করিয়ে তাকে সন্তানসহ মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন। অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি একাকী মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার অদূরে

'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছলে কা'বাগৃহের চাবি রক্ষক ওছমান বিন তালহা তার এই নিঃসঙ্গ যাত্রা দেখে ব্যথিত হন এবং তিনি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হন। তাঁকে তার সন্তানসহ উটে সওয়ার করিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে যখন মদীনার উপকণ্ঠে ক্বোবায় বনু আমর বিন 'আওফ গোত্রে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে বললেন, তোমার স্বামী এই গোত্রে আছেন।

অতএব 'আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর তুমি এই গোত্রে প্রবেশ কর'। এই বলে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় মক্কার পথে ফিরে আসেন (ইবনু হিশাম ১/৪৬৯-৭০)।

ওছমান বিন ত্বালহা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন ও ইসলাম কবুল করেন। তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের শেষের দিকে আজনাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) তাদের বংশেই কা'বাগৃহের চাবি রেখে দেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই চাবি তোমাদের হাতেই থাকবে। যালেম ব্যতীত কেউ এটা ছিনিয়ে নিবেনা'।

উম্মে সালামাহ ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ প্রথম দিকের মুসলমান ছিলেন। একটি বর্ণনা মতে আবু সালামা ছিলেন একাদশতম মুসলমান। তাদের স্বামী-স্ত্রীর আক্বীদা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তদুপরি আবু সালামা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দুধভাই। তাঁরা দু'জনেই শৈশবে আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবাহর দুধপান করেছিলেন । তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন এবং ওহোদের যুদ্ধে আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন। তখন দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে উম্মে সালামাহ দারুণ কষ্টে নিপতিত হন।

)২) হায়েব জমী (: তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কিছু দূর যেতেই মুশরিকরা তাকে রাস্তায় ঘিরে ফেলে। তখন সওয়ারী থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেখ তোমরা জানো যে, আমার তীর সাধারণতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অতএব আমার তূণীরে একটা তীর বাকী থাকতেও তোমরা আমার কাছে ভিড়তে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। অতএব তোমরা যদি দুনিয়াবী স্বার্থ চাও, তবে মক্কায় রক্ষিত আমার বিপুল ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলি নিয়ে নাও এবং আমার পথ ছাড়। তখন তারা পথ ছেড়ে দিল। মদীনায় পৌঁছে এই ঘটনা বর্ণনা করলে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে'। ছুহায়েব-এর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করে সূরা বাক্বারাহর ২০৭ আয়াতটি নাযিল হয়। 'লোকদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজি রাখে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব স্নেহশীল' (বাক্বারাহ ২/২০৭)।

ছুহায়েব বিন সিনান বিন মালেক রূমী ইরাকের মূছেল নগরীতে দাজলা নদীর তীরবর্তী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে মক্কায় এসে আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন তামীমীর সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র )خليف( হন। 'আম্মার বিন ইয়াসিরের সাথে তিনি দারুল আরকামে এসে ইসলাম কবুল করেন এবং আল্লাহর পথে নির্যাতিত হন। পরে আলী (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৮ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ( : বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, তিনি বিশ জনকে নিয়ে হিজরত করেন । ইবনু ইসহাক 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেন যে, ওমর (রাঃ) গোপনে হিজরত করেন। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ এবং হেশাম বিন 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রত্যুষে একস্থানে হাযির হয়ে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাফেররা হেশাম-কে বন্দী করে ফেলে। অতঃপর 'আইয়াশ ওমর (রাঃ)-এর সাথে যখন মদীনায় 'বোবা'-তে পৌঁছে গেলেন, তখন পিছে পিছে আবু জাহল ও তার ভাই হারেছ গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং বলল যে, হে 'আইয়াশ। তোমার ও আমার মা মানত করেছেন যে, যতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবেন, ততক্ষণ চুল আঁচড়াবেন না এবং রোদ ছেড়ে ছায়ায় যাবেন না'। একথা শুনে 'আইয়াশের মধ্যেমায়ের দরদ উথলে উঠলো এবং সাথে সাথে মক্কায় ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল। ওমর (রাঃ) আবু জাহলের চালাকি আঁচ করতে পেরে 'আইয়াশকে নিষেধ করলেন এবং বুঝিয়ে বললেন যে, আল্লাহর কসম! তোমাকে তোমার দ্বীন থেকে সরিয়ে নেবার জন্য এরা কূট কৌশল করেছে। আল্লাহর কসম! তোমার মাকে যদি উকুনে কষ্ট দেয়, তাহ'লে তিনি অবশ্যই চিরুনী ব্যবহার করবেন। আর যদি রোদে কষ্ট দেয়, তাহ'লে অবশ্যই তিনি ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিবেন। অতএব তুমি ওদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ো না। কিন্তু 'আইয়াশ কোন কথাই শুনলেন না। তখন ওমর (রাঃ) তাকে শেষ পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমার এই দ্রুতগামী উটনীটা নিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে একই উটে সওয়ার হয়ো না। মক্কায় গিয়ে উটনীটাকে

নিজের আয়ত্তে রাখবে এবং কোনরূপ মন্দ আশংকা করলে এতে সওয়ার হয়ে পালিয়ে আসবে। উল্লেখ্য যে, আবু জাহল, হারেছ ও 'আইয়াশ তিনজন ছিল একই মায়ের সন্তান।

মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে ধূর্ত আবু জাহল বলল, হে 'আইয়াশ! আমার উটটাকে নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি। তুমি কি আমাকে তোমার উটে সওয়ার করে নিবে? 'আইয়াশ সরল মনে রাযী হয়ে গেলেন এবং উট থামিয়ে মাটিতে নেমে পড়লেন। তখন দু'জনে একত্রে 'আইয়াশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল এবং ঐ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছল। এভাবে হেশাম ও 'আইয়াশ মক্কায় কাফেরদের একটি বন্দীশালায় আটকে পড়ে থাকলেন

পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় গিয়ে একদিন সকলকে উদ্দেশ্য করে

বললেন, 'কে আছ যে আমার জন্য 'আইয়াশ ও হেশামকে মুক্ত করে আনবে?' তখন অলীদ বিন অলীদ বিন মুগীরাহ বলে উঠলেন, ঐ দু'জনের সাহায্যে আমি প্রস্তুত আপনার জন্য হে আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর তিনি গোপনে মক্কায় পৌঁছে ঐ বন্দীশালায় খাবার পরিবেশনকারীণী মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দেওয়াল টপকে ছাদবিহীন উক্ত যিন্দানখানার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে তাদেরকে বাঁধনমুক্ত করে মদীনায় নিয়ে এলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর, বিতর ও ফজরের ছালাতে রুকু থেকে উঠে দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট অলীদ বিন অলীদ, সালামাহ বিন হিশাম, 'আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ-র নাম ধরে তাদের মুক্তির জন্য এবং (মক্কার) দুর্বল মমিনদের জন্য দো'আ করতেন' । তিনি রামাযানে ১৫ দিন যাবৎ বেন। অলীদ বিন অলীদ ছিলেন খালেদ বিন অলীদের ভাই' ।
উপরে বর্ণিত বারা বিন 'আযেব ও ইবনু ইসহাক-এর দু'টি বর্ণনার সমন্বয় এটাই হ'তে পারে যে, ওমর (রাঃ)-এর ২০জন সাথী রাস্তায় পরস্পরে মিলিত হন। অতঃপর তারা প্রায় একই সময়ে মদীনায় পৌছে যান (মা শা-'আ ৭১ পৃঃ)।

এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম মক্কা হ'তে মদীনায় গোপনে পাড়ি জমাতে থাকেন। ফলে বায়'আতে কুবরার পর দু'মাসের মধ্যেই প্রায় সকলে মদীনায় হিজরত করে যান। কেবল কিছু দুর্বল মুসলমান মক্কায় অবশিষ্ট থাকেন। যাদেরকে মুশরিকরা বিভিন্ন সুবিধা দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক আটকে রেখেছিল।

রাসূল (সঃ) এর হিজরত

ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কা'বায় ছালাত আদায়ে বাধা ও নানাবিধ কষ্ট দানের পরেও কোনভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দমিত করতে না পেরে অবশেষে তারা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

যেটা ছিল হিজরতের প্রত্যক্ষ কারণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরায়েশ নেতাদের একটি দল হিজরে )( একত্রিত হয়। অতঃপর লাত, মানাত ও 'উযযার নামে শপথ করে বলে যে, এবার আমরা মুহাম্মাদকে দেখলে একযোগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে আসব না'।

একথা জানতে পেরে ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলেন এবং উক্ত খবর দিয়ে বললেন যে, ঐ নেতারা আপনাকে হত্যা করে রক্তমূল্য নিজেরা ভাগ করে পরিশোধ করবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, বেটি! আমাকে ওযুর পানি দাও। অতঃপর ওযু করে তিনি সোজা হারামে চলে গেলেন ও তাদের মজলিসে প্রবেশ করলেন। তারা তাঁকে দেখে বলে উঠল, এই তো সে ব্যক্তি। কিন্তু কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে বা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। এ সময় তিনি তাদের দিকে এক মুষ্টি মাটি

ছুঁড়ে মেরে বলেন, 'চেহারাসমূহ ধূলি মলিন হৌক'! রাবী বলেন, ঐ মাটি যার গায়েই লেগেছিল, সেই-ই বদরের যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছিল'।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ, ইবরাহীম ও মূসা (আঃ) আল্লাহ্র পথে চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। অন্যদের মধ্যে বহুসংখ্যক নবীকে সরাসরি হত্যা করা হয়েছে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে সক্ষম না হ'লেও তাকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতন

'আমাকে আল্লাহ্ পথে যেভাবে ভীত করা হয়েছে এমনটি কাউকে করা হয়নি। আমি আল্লাহর পথে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছি, এমনটি কেউ হয়নি। মাসের ত্রিশটি দিন ও রাত আমার ও আমার পরিবারের কোন খাদ্য জোটেনি। বেলালের বগলে যতটুকু লুকানো সম্ভব ততটুকু খাদ্য ব্যতীত' (অর্থাৎ খুবই সামান্য)। বলা বাহুল্য এভাবে চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পরেই আল্লাহ তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেন।

**হিজরত শুরু**

১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ী থেকে হিজরত শুরু হয় এবং রাত থাকতেই তাঁরা ৩ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে ছওর গিরিগুহায় পৌঁছে যান। অতঃপর সেখানে তাঁরা শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার তিনদিন তিন রাত অবস্থান করেন। এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৩ বছর।

**বিবরণ** )( : আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিজরতের দিন ভরদুপুরে একটা কাপড়ে মাথা ঢেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বাড়ীতে আসেন। যেসময় সাধারণতঃ কেউ বের হয় না। তিনি এসে আবুবকরকে বললেন যে, তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমরা তখন তাঁদের সফরের জন্য দ্রুত গোছ-গাছ শুরু করে দিলাম (বড় বোন) আসমা তার কোমরবন্দ ছিড়ে তার এক অংশ দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দেন অন্য অংশ নিজের ব্যবহারে রাখেন।

তিনি বলেন, আবুবকর আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। কেননা চারমাস পূর্বেই (অর্থাৎ ২য় বায়'আতের পর থেকে হিজরতপূর্ব সময়ের মধ্যে) রাসূল (ছাঃ) সকলকে জানিয়েছিলেন যে, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, যা কালো পাথুরে মাটির মাঝে খেজুর বাগিচা সমৃদ্ধ এলাকা। তখন থেকেই মুসলমানগণ ইয়াছরিবে হিজরত করতে থাকেন। এমনকি হাবশা থেকেও অনেকে ফিরে ইয়াছরিবে যান। তবে জা'ফর বিন আবু তালেব তখনও সেখানে ছিলেন। এক পর্যায়ে আবুবকরও ইয়াছরিবে

চলে যেতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, 'থেমে যাও! আশা করছি যে, আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে' । ফলে সেদিন থেকেই আবুবকর দু'টি দ্রুতগামী বাহন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।সেখানে তিনরাত আত্মগোপনে থাকেন। সঙ্গে আমার ভাই আব্দুল্লাহ থাকত এবং ভোরের অন্ধকার থাকতেই সে চলে আসত। যাতে লোকেরা বুঝতে না পারে যে, যে বাইে ছিল। আমাদের মুক্তদাস 'আমের বিন ফুহায়রা দুম্বা চরাত এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে দুধ পান করাত। এভাবে তিনরাত কেটে যায়। অতঃপর তাঁরা বহু 'আবদ বিন 'আলী গোত্র থেকে একজন দক্ষ পথপ্রদর্শকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। যারা 'আছ বিন ওয়ায়েল সাহমী গোত্রের মিত্র ছিল। ঐ ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ বিন উরাইত্বিত্ব) কাফেরদের দ্বীনের উপর ছিল। অতঃপর তিনরাত্রির পরদিন (সোমবার) প্রত্যুষে )( তাঁরা রওয়ানা হন এ সময় তাঁদের সাথে ছিল 'আমের বিন ফুহায়রা এবং পথপ্রদর্শক ব্যাক্তি। সিদি তাদেরকে নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে যাত্রা করেন'।

এ কথাটি অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা থেকে তাঁর যাত্রা ছিল

সোমবারে এবং মদীনায় উপস্থিতি ছিল সোমবারে'। ইবনু হাজার বলেন, সেখানে তিনরাত কাটান। শনি, রবি ও সোম। অতঃপর সোমবার রাত থাকতে থাকতেই গুহা থেকে বের হয়ে রওয়ানা দেন'।

হিজরতের উক্ত সংকটময় রাতের কথা বলতে গিয়ে ওমর (রাঃ) আল্লাহর কসম করে এক রাতের আমল ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম ছিল'।

মক্কা ত্যাগকালে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিক্রিয়া )

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন হাজুনে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসী 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জনপদ ও আল্লাহর নিকট আল্লাহর মাটিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মাটি। যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দেওয়া হ'ত, তাহ'লে আমি বেরিয়ে যেতাম না'।

এ প্রসঙ্গে যে আয়াতটি নাযিল হয় তা নিম্নরূপ-

- ْوَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُم

'যে জনপদ তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তার চাইতে কত শক্তিশালী জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি। অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না' (মুহাম্মাদ ৪৭/১৩)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতটি হিজরতকালে মক্কা ত্যাগের সময় নাযিল হয়।

গুহার মুখে শত্রুদল )( :

রাসূল (ছাঃ)-কে না পেয়ে কুরায়েশরা চারিদিকে অনুসন্ধানী দল পাঠায় এবং ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ও আবুবকরকে বা দু'জনের কাউকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। ৩০৬ সন্ধানী দল এক সময় ছওর গিরিগুহার মুখে গিয়ে পৌছে। এ সময়কার অবস্থা আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন এভাবে , 'গুহায় থাকা অবস্থায় আমি আমাদের মাথার উপরে তাদের পাগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যদি তাদের কেউ নীচের দিকে তাকায়, তাহ'লে আমাদেরকে তার পায়ের নীচে দেখতে পাবে। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন ধারণা করছ কেন? আল্লাহ আছেন তৃতীয় হিসাবে'। বিষয়টির বর্ণনা আল্লাহ দিয়েছেন এভাবে-

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة(٤٠

'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল দু'জনের হিসাবে। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। যখন সে তার সাথীকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তার

সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। আর আল্লাহ কাফেরদের শিরকী কালেমা নীচু করে দিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাওহীদের কালেমা সদা উন্নত। আল্লাহ হ'লেন পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' (তওবা ৯/৪০)।

রক্তপিপাসু শত্রুকে সামনে রেখে ঐ সময়ের ঐ নাযুক অবস্থায় (চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন), এই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়া কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে কায়মনোচিত্তে নিজেকে আল্লাহর উপরে সোপর্দ করে দেন। দুনিয়াবী কোন উপায়-উপকরণের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সংকটকালে আরও কয়েকবার বলেছেন। এখানে 'অদৃশ্য বাহিনী' বলতে ফেরেশতাগণ হ'তে পারে কিংবা অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি হ'তে পারে, যা মানুষের কল্পনার বাইরে। মূলতঃ সবই আল্লাহর বাহিনী। সবচেয়ে বড় কথা, সারা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গুহা মুখে পৌঁছেও তারা গুহার মধ্যে খুঁজল না, এমনকি নীচের দিকে তাকিয়েও দেখল না। তাদের এই মনের পরিবর্তনটাই। পক্ষ থেকে ছিল সরাসরি গায়েবী মদদ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রভুর সেনাবাহিনীর খবর তোমার প্রভু ব্যতীত কেউ জানে না' (মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)। আর একারণেই হাযারো প্রস্তুতি নিয়েও অবশেষে কুফরীর ঝাণ্ডা অবনমিত হয় ও তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়। আল্লাহ বলেন, CATCH اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল' (নাহল ১৬/১২৮)।

: (المغالاة في قصة الهجرة) foafero Ra

হিজরতের কাহিনীতে বহু কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা যুক্ত হয়েছে। যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন, (ক) রাসূল (ছাঃ) ছওর গুহায় প্রবেশের পর আবুবকর (রাঃ) গুহাটি পরিষ্কার করলেন এবং নিজের পায়জামা ছিঁড়ে এর মধ্যেকার গর্তগুলি পূরণ করে দেন। কিন্তু দু'টি গর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি ঐ দু'টি গর্তের মুখে পা দিয়ে রাখেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে সাপ কিংবা বিচ্ছু আবুবকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশন করে। এতে তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন।

কিন্তু রাসূল (ছাঃ) জেগে উঠবেন সেই ভয়ে নড়াচড়া করেননি। একপর্যায়ে বিষের তীব্র যন্ত্রণায় তার চোখের পানি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে ঝরে পড়লে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তখন রাসূল (ছাঃ) নিজের মুখের লালা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে বিষের যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। পরবর্তীতে তার বিষের ব্যথা ফিরে আসে এবং এটাই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ'। ৩০৮ আবুবকর ঐ সময় কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজের জন্য কাঁদছিনা, বরং আমি ভয় পাচ্ছি হে রাসূল! আপনার কি হবে? এছাড়া (খ) ছওর গুহার মুখে মাকড়সার জাল বোনা, (গ) একটি বৃক্ষের জন্ম হওয়া ও রাসূল (ছাঃ)-কে ঢেকে দেওয়া (ঘ) সেখানে এসে দু'টি কবুতরের বাসা বাঁধা ও তাতে ডিম পাড়া ইত্যাদি সবই বানোয়াট ও কল্পকাহিনী মাত্র। বরং এটাই সঠিক যে, আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁদেরকে গায়েবী মদদ করেছিলেন এবং কুরায়েশদের প্রেরিত অনুসন্ধানী দলের দৃষ্টিকে আল্লাহ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যা আবুবকর (রাঃ)-এর বক্তব্য থেকেই বুঝা যায়। পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহ একইভাবে গায়েবী মদদ করেন।

## মদিনার সামাজিক অবস্থা

খ্রিষ্টীয় ৭০ সালে প্রথমবার এবং ১৩২-৩৫ সালে দ্বিতীয়বার খ্রিষ্টান রোমকদের হামলায় বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদীরা ইয়াছরিব ও হিজায অঞ্চলে হিজরত করে (। মিষ্ট পানি, উর্বর অঞ্চল এবং শামের দিকে ব্যবসায়ী পথের গুরুত্বের কারণে ইহুদী বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোত্রদ্বয় ইয়াছরিবের পূর্ব অংশ হাররাহ (১) এলাকায় বসতি স্থাপন করে। তাদের অপর গোত্র বনু কায়নুঝা ইয়াছরিবের নিম্নভূমিতে বসতি স্থাপন করে। বনু কায়নুক্বার শাখা গোত্রসমূহের আরবী নাম দেখে তাদেরকে আরব থেকে ধর্মান্তরিত ইহূদী বলে ঐতিহাসিকগণের অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন বনু ইকরিমা, বনু মু'আবিয়া, বনু 'আওফ, বনু ছা'লাবাহ প্রভৃতি নাম সমূহ। উপরোক্ত তিনটি প্রধান গোত্র ছাড়াও ছোট ছোট বিশটির অধিক ইহুদী শাখা গোত্রসমূহ ইয়াছরিবের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

অন্যদিকে আউস ও খাযরাজ, যারা ইসমাঈল-পুত্র নাবেত )(-এর বংশধর ছিল এবং

ইয়ামনের আযদ (১) গোত্রের দিকে সম্পর্কিত ছিল, তারা খ্রিষ্টীয় ২০৭ সালের দিকে

ইয়ামন থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন সময়ে ইয়াছরিবে হিজরত করে। সেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থানরত ইহুদীরা তাদেরকে ইয়াছরিবের অনুর্বর ও পরিত্যক্ত এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য করে। আউসরা বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার প্রতিবেশী হয় এবং খাযরাজরা বনু ক্বায়নুক্বার প্রতিবেশী হয়। আউসদের এলাকা খাযরাজদের এলাকার চাইতে অধিকতর উর্বর ছিল। ফলে তাদের মধ্যে নিয়মিত হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এটাও একটা কারণ ছিল। ইহুদীরা উভয় গোত্রের উপর কর্তৃত্ব করত। তারা উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত। আবার উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করে দিত। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত বু'আছ যুদ্ধ। যাতে আউসরা খাযরাজদের উপর জয়লাভ করে। কিন্তু উভয় গোত্র সর্বদা পুনরায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা করত। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে এবং উভয় গোত্রের ঐক্যমতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই খাযরাজীকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর শুভাগমনে তারা উৎফুল্ল হয় এবং নিজেদের মধ্যকার সব তিক্ততা ভুলে শেষনবী (ছাঃ)-কে স্বাগত জানাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, বু'আছ যুদ্ধের দিনটিকে আল্লাহ তাঁর রাসূলের আগমনের এবং 'ইয়াছরিব' হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আউস ও খাযরাজ ছিলেন আপন দুই ভাই এবং ইসমাঈল-পুত্র নাবেত-এর বংশধর। যারা উত্তর হেজায শাসন করতেন। কিন্তু মালেক বিন 'আজলান খাযরাজীর গোলাম হুর বিন সুমাইরকে হত্যার কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যা প্রায় ১২০ বছর যাবৎ চলে। পরে তারা ইয়াছরিবে হিজরত করেন। সেখানে তাদের মধ্যে সর্বশেষ বু'আছ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার পাঁচ বছর পর রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের বরকতে উভয় দলের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয় এবং তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। যে বিষয়ে সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত নাযিল হয়

২০৭ খ্রিষ্টাব্দে একই সময় বনু খোযা'আহ গোত্র ইয়ামন থেকে হিজরত করে মক্কার নিকটবর্তী মারুয যাহরানে বসতি স্থাপন করে। যারা পরবর্তীকালে মক্কার শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং দীর্ঘদিন উক্ত ক্ষমতায় থাকে। অবশেষে তাদের জামাতা কুরায়েশ নেতা কুছাই বিন কিলাব মক্কার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। জামাতার বংশ হিসাবে বনু খোযা'আহ সর্বদা বনু হাশেমকে সহযোগিতা করেছে। যা মক্কা বিজয় ও তার পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।

মক্কা ও মদীনার সামাজিক অবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কার সমাজ ব্যবস্থাপনায় কুরায়েশদের একক প্রভুত্ব ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশ মূর্তিপূজারী ছিল। যদিও সবাই আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। হজ্জ ও ওমরাহ করত। ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপরে কায়েম আছে বলে তারা নিজেদেরকে 'হানীফ' )( বা 'আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ' বলে দাবী করত। বিগত নেককার লোকদের মূর্তির অসীলায় তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত। এই অসীলাপূজার কারণেই তারা মুশরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়েছিল। তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রচারিত নির্ভেজাল তাওহীদকে তাদের কপট ধর্ম বিশ্বাস ও দুনিয়াবী স্বার্থের বিরোধী সাব্যস্ত করে রাসূল (ছাঃ)-এর ও মুসলমানদের রক্তকে হালাল গণ্য করেছিল। মক্কায় মুসলমানরা ছিল দুর্বল ও মযলূম এবং বিরোধী কুরায়েশ নেতারা ছিল প্রবল ও পরাক্রমশালী।

পক্ষান্তরে মদীনায় সমাজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কারু একক নেতৃত্ব ছিল না। ধর্মীয় দিক দিয়েও তারা এক ছিল না বা বংশধারার দিক দিয়েও এক ছিল না। সর্বশেষ বু'আছের যুদ্ধে বিপর্যস্ত আউস ও খাযরাজ প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। এর দ্বারা মদীনাবাসীদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, তাঁর আগমনের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটবে। ফলে এখানে রাসূল (ছাঃ) ও মুহাজিরগণ ছিলেন শুরু থেকেই কর্তৃত্বের অধিকারী।হিজরতকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়াছরিবে মূলতঃ দু'দল লোক বসবাস করত। একদল ছিল ইয়াছরিবের পৌত্তলিক মুশরিক সম্প্রদায়। যারা প্রধানতঃ আউস ও খাযরাজ দু'গোত্রে বিভক্ত ছিল। আউসদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন ওবাদাহ। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলুল ছিলেন খাযরাজ

গোত্রভুক্ত। এরা ছিল বিশুদ্ধ আরবী ভাষী। রাসূল (ছাঃ)-এর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারও ছিল এই গোত্রভুক্ত।

দ্বিতীয় ছিল ইহুদী সম্প্রদায়। খ্রিষ্টানরা যাদেরকে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে উৎখাত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপর দখল কায়েম করেছিল। ইহুদীরা শেষনবীর আগমনের অপেক্ষায় এবং তাঁর নেতৃত্বে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল বহুদিন পূর্বে। এরা ছিল হিব্রুভাষী। কিন্তু পরে আরবীভাষী হয়। এদের প্রধান তিনটি গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা', বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা মদীনার উপকণ্ঠে তাদের তৈরী স্ব স্ব দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহে বসবাস করত। দক্ষ ব্যবসায়ী ও সূদী কারবারী হওয়ার কারণে এরা ছিল সর্বাধিক সচ্ছল। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের মাধ্যমে এরা আউস ও খাযরাজের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখতো এবং 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতির মাধ্যমে উভয় গোত্রের উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। এই সূক্ষ্ম পলিসির কারণে তাদের বনু কায়নুক্বা' গোষ্ঠী খাযরাজদের মিত্র ছিল এবং বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোষ্ঠী আউসদের মিত্র ছিল। আসলে তারা উভয়েরই শত্রু ছিল। তাদেরকে তারা সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। তারা এভাবে আরবদের শোষণ করত। এজন্য তাদের মূর্খতার প্রতি তাচ্ছিল্য করে তারা 'মূর্খদের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই' (আলে ইমরান ৩/৭৫)। অর্থাৎ মূর্খদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের অধিকার নষ্ট করায় আমাদের কোন পাপ নেই। সেই সময় ইয়াছরিবে পৌত্তলিক ও ইহুদীদের বাইরে কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টানও বসবাস করত। যারা ইহুদীদের ন্যায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল শেষনবীর আগমন প্রত্যাশায়।

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিগুলি গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শ্লোগানের আড়ালে উন্নয়নশীল ও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের শোষণ-নির্যাতন, সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসা পূর্বের ন্যায় বজায় রেখে চলেছে। মুসলমানদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের অধিকার বিনষ্ট করায় কোন পাপ নেই বলে আজও তাদের আচরণে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূগর্ভের তৈল লুট করার জন্য তারা ভূপৃষ্ঠের মানুষের রক্ত পান করছে গোগ্রাসে। কিন্তু এই রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারদের রক্ত নেশা মিটছে না মোটেই। এজন্যেই এরা 'মাগযুব' (অভিশপ্ত) ও 'যোওয়াল্লীন' (পথভ্রষ্ট) বলে কুরআনে অভিহিত

হয়েছে।ইহুদীরা ভেবেছিল, শেষনবী হযরত ইসহাকের বংশে হবেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। তারা ইয়াছরিবের লোকদের হুমকি দিত এই বলে যে, 'আখেরী যামানার নবী সত্বর আগমন করবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হব এবং তোমাদের হত্যা করব (বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি) 'আদ ও ইরামের ন্যায়'। ৩৩২ কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে শেষনবীর আগমন ঘটায় এবং তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ) উভয়ের সত্যায়ন করায় ইহুদীরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে তৃতীয় দল খ্রিষ্টানরা ভেবেছিল যে, শেষনবী এসে তাদের লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী কথিত ত্রিত্ববাদ, ঈসার পুত্রত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ববাদ, সন্ন্যাসবাদ ও পোপের ঐশী নেতৃত্ববাদ সমর্থন করবেন। কিন্তু এসবের বিপরীত হওয়ায় তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধী হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, ইহূদী ও নাছারা কারু মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কোনরূপ সংগ্রামী চেতনা ছিল না। ধর্মের প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত, সেটা ছিল কেবল জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, শুভাশুভ লক্ষণ নির্ধারণ ও অনুরূপ কিছু ক্রিয়া-কর্ম। এ সকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী-গুণী এবং আধ্যাত্মিক গুরু ও নেতা মনে করত।

চতুর্থ আরেকটি উপদল গড়ে উঠেছিল খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূলের নেতৃত্বে। বু'আছ যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলে তাকে নেতা নির্বাচিত করে। এজন্য তারা বহু মূল্যবান রাজমুকুট তৈরী করে এবং এই প্রথমবারের মত উভয় গোত্র একত্রিত হয়ে তাকে রাজ আসনে বসাতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং উভয় গোত্র তাকে ছেড়ে রাসূল (ছাঃ)-কে নেতারূপে বরণ করে। এতে আব্দুল্লাহ ও তার অনুসারীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের সকল ক্ষোভগিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না দেখে তারা চুপ থাকে এবং বছর দেড়েক পরে বদর যুদ্ধের পর হতাশ হয়ে অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়। তবে আদি বাসিন্দা আউস ও খাযরাজদের অনেকে পূর্বেই ইসলাম কবুল করায় এবং তারাই রাসূল (ছাঃ)-কে ও মুহাজিরগণকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্রয় দেওয়ায় অন্যেরা সবাই চুপ থাকে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নেয়।

উপরোক্ত চারটি দল তথা (১) পৌত্তলিক আউস ও খাযরাজ (২) ইহুদী। বনু কায়নুক্বা, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা। (৩) নাছারা। যারা প্রধানতঃ নাবিত্ব বাজার )( এলাকায় বসবাস করত। তবে সমাজে তাদের তেমন কোন প্রভাব ছিল না। (৪) খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের গ্রুপ। যারা গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে সর্বদা তৎপর ছিল।এতদ্ব্যতীত (৫) মুহাজির মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা মুকাবিলা করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বলতে গেলে জ্বলন্ত সমস্যা ছিল। তবে মুহাজিরদের সমস্যা আনছাররাই মিটিয়ে দিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পরস্পরে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মক্কা থেকে কোন মহাজির এলেই তারা তাকে সাদরে বরণ করে নিত ফলে মুহাজিরগণের সমস্যা ছিল পজেটিভ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের সমস্যা ছিল নেগেটিভ। যা সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-কে চিন্তাগ্রস্ত করে রাখতো।

উপরোক্ত সমস্যাবলীর সাথে যোগ হয়েছিল আরেকটি কঠিন সমস্যা। সেটা ছিল (৬) মক্কার মুশরিকদের অপতৎপরতা। তারা মুহাজিরদের ফেলে আসা বাড়ী-ঘর ও ধন. সম্পত্তি জবরদখল করে নিল। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বন্দী ও নির্যাতন করতে লাগল। অধিকন্তু তাদের ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের উস্কানি দিতে লাগল, যাতে মদীনায় খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ তারা বন্ধ করে দেয়। ফলে মদীনায় পণ্য আমদানী হ্রাস পেতে থাকল। যা মক্কার মুশরিকদের সাথে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী করে ফেলল।

## ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংশোধন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপন। সেজন্য তিনি ক্বোবায় প্রথম মসজিদ নির্মাণের পর এব মদীনায় প্রধান মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন।

মদীনায় প্রবেশ করে রাসূল (ছাঃ)-এর উটনী যে স্থানে প্রথম বসে পড়েছিল, সে স্থানটিই হ'ল পরবর্তীতে মসজিদে নববীর দরজার স্থান। স্থানটির মালিক ছিল দু' ইয়াতীম বালক সাহল ও সোহায়েল বিন রাফে' বিন 'আমর। এটি তখন তাদের খো শুকানোর চাতাল ছিল (ইবনু হিশাম ১/৪৯৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ দীনার মূল্যে স্থা খরীদ করলেন। আবুবকর (রাঃ) মূল্য পরিশোধ করলেন। ৩০৭ অতঃপর তার আশপাল মুশরিকদের কবরগুলি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং ভগ্নস্তূপগুলি সরিয়ে স্থানটি সমতল হয়। গারক্বাদের খেজুর গাছগুলি উঠিয়ে সেগুলিকে ক্বিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে প দেওয়া হয়' (বুখারী হা/৪২৮)। অতঃপর খেজুর গাছ ও তার পাতা দিয়ে মসজিদ হয়। চার বছর পর এটি কাঁচা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। ৩০৮ ঐ সময় আল্লাহর হুল ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা ছিল ইহুদীদের ক্বিবলা এবং মদীনা থেকে দিকে। মসজিদের ভিত ছিল প্রায় তিন হাত উঁচু। দরজা ছিল তিনটি। যার দু'বাহু স্তুগুলি ছিল পাথরের, মধ্যের খাম্বাগুলি খেজুর বৃক্ষের, দেওয়াল কাঁচা ইটের, ছাদ নে পাতার এবং বালু ও ছোট কংকর বিছানো মেঝে- এই নিয়ে তৈরী হ'ল মসজিদে ন যা তখন ছিল ৭০×৬০×৫ হাত মোট ৪২০০ বর্গ হাত আয়তন বিশিষ্ট। যেখানে ন বৃষ্টি পড়ত। ১৬ বা ১৭ মাস পরে ক্বিবলা পরিবর্তিত হ'লে উত্তর দেওয়ালের বা দক্ষিণ দেওয়ালের দিকে ক্বিবলা ঘুরে যায়। ফলে পিছনে একমাত্র দরজাটিই ক্বিবলা হয়েছে। ৩৯ কেননা মক্কা হ'ল মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে।

'উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, আনছারগণ মাল জমা করে রাসূল (ছাঃ)-এর নি আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এদিয়ে আপনি মসজিদটি আরও সুন্দর করে নির্মাণ করুন। কতদিন আমরা এই ছাপড়ার নীচে ছালাত আদায় করব? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার ভাই মুসার ছাপরার ছাপরা থেকে ফিরে আসতে আমার কোন আগ্রহ নেই

সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজ হাতে ইট ও পাথর বহন করেন। এ সময় তিনি সাথীদের উৎসাহিত করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ব্যতীত কোন আরাম নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের

ক্ষমা কর' (বুখারী হা/৪২৮)। আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের সাহায্য কর' (বুখারী হা/৩৯৩২)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই পুরস্কার হ'ল আখেরাতের পুরস্কার। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ কর' উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বলেন, - এই বোঝা খায়বরের বোঝা নয়। হে আমাদের প্রভু! একাজ অতীব পুণ্যময় ও পবিত্র')। রাসূল (ছাঃ)-এর যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী কাজ করেন, তবে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে হবে নিতান্তই ভ্রান্ত কাজ' (বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬)।

আযানের প্রবর্তন :

মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর মুছল্লীদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আহ্বানের জন্য পরামর্শসভা বসে। ছাহাবীগণ বিভিন্ন পরামর্শ দেন। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। পরদিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন 'আব্দে রব্বিহী (রাঃ) প্রথমে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বর্তমান আযানের শব্দ সমূহ সহ স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনালে তিনি তার সত্যায়ন করেন। অতঃপর উচ্চকণ্ঠের অধিকারী বেলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের ধ্বনি শুনে কাপড় ঘেঁষতে ঘেঁষতে ওমর (রাঃ) দৌড়ে এসে বললেন 'হে আল্লাহ্র রাসূল! যিনিআপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফালিল্লা-হিল হামদ' 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা' একটি বর্ণনা মতে ঐ রাতে ১১ জন ছাহাবী একই আযানের স্বপ্ন দেখেন'। উল্লেখ্য যে, ওমর ফারুক (রাঃ) ২০ দিন পূর্বে উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আগেই বলেছে দেখে লজ্জায় তিনি নিজের কথা প্রকাশ করেননি।

বলা বাহুল্য, এই আযান কেবল ধ্বনি মাত্র ছিল না। বরং এ ছিল শিরকের অমানিশা ভেদকারী আপোষহীন তাওহীদের এক দ্ব্যর্থহীন আহ্বান। যা কেবল সে যুগে মদীনার মুশরিক ও ইহুদী-নাছারাদের হৃদয়কে ভীত-কম্পিত করেনি, বরং যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত শিরকী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা। এ আযান যুগে যুগে প্রত্যেক আল্লাহপ্রেমীর হৃদয়ে এনে দেয় এক অনন্য প্রেমের অনবদ্য মূর্ছনা। যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুমিন পাগলপারা হয়ে ছুটে চলে মসজিদের পানে। লুটিয়ে পড়ে সিজদায় স্বীয় প্রভুর সকাশে। তনুমন ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করে

আল্লাহর দরবারে। বাংলার কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খৃ.) তাই কত সুন্দরই না গেয়েছেন-

কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি'।-

ইহুদীদের বাঁশি, নাছারাদের ঘণ্টাধ্বনি ও পৌত্তলিকদের বাদ্য-বাজনার বিপরীতে মুসলমানদের আযান ধ্বনির মধ্যেকার পার্থক্য আসমান ও যমীনের পার্থক্যের ন্যায়। আযানের মধ্যে রয়েছে ধ্বনির সাথে বাণী, রয়েছে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, রয়েছে তাওহীদের বিচ্ছুরণ এবং রয়েছে আত্মনিবেদন ও আত্মকল্যাণের এক হৃদয়ভেদী অনুরণন। এমন বহুমুখী অর্থবহ মর্মস্পর্শী ও সুউচ্চ আহ্বানধ্বনি পৃথিবীর কোন ধর্মে বা কোন জাতির মধ্যে নেই। ১ম হিজরী সনে আযান চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তা প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে দিকে অবিরামভাবে অপ্রতিহত গতিতে। আহ্নিক গতির কারণে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর প্রতি স্থানে সর্বদা ছালাতের সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে আযানের সময়ের। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা প্রতিটি মিনিটে ও সেকেণ্ডে আযান উচ্চারিত হচ্ছে। আর সেই সাথে ধ্বনিত হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যবাণী এবং উচ্চকিত হচ্ছে সর্বত্র আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও বড়ত্বের অনন্য ধ্বনি। যার সাক্ষীহচ্ছে প্রতিটি সজীব ও নির্জীব বস্তু ও প্রাণী। এমনকি পানির মধ্যে বিচরণকারী মৎস্যকুল। মানুষ যদি কখনো এ আহ্বানের মর্ম বুঝে এগিয়ে আসে, তবে পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যাবে সকল প্রকার শিরকী জাহেলিয়াতের গাঢ় অমানিশা। টুটে যাবে মানুষের প্রতি মানুষের দাসত্ব নিগড়। প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর গোলামীর অধীনে সকল মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। শৃংখলমুক্ত হবে সত্য, ন্যায় ও মানবতা। আযান তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিরংকুশ উলুহিয়াতের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। বিশ্বমানবতার একক চেতনা ও কল্যাণের হৃদয়স্রাবী দ্যোতনা।

আহলে ছুফফাহ )أهل الصفة( :

মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ মদীনায় এসে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন। অতঃপর মসজিদে নববী নির্মাণ শেষে তার পিছনে একটি ছাপড়া দেওয়া হয়। যেখানে

নিরাশ্রয় মুহাজিরগণ এসে বসবাস করতেন। 'ছুফফাহ' অর্থ ছাপড়া। যা দিয়ে ছায়া করা হয়। এভাবে মুহাজিরগণই ছিলেন আহলে ছুফফার প্রথম দল। যাঁদেরকে বলা হ'ত (আবুদাউদ হা/৪০০৩)। এছাড়া অন্যান্য স্থান হ'তেও অসহায় মুসলমানরা এসে এখানে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতেন (আহমাদ হা/১৬০৩১)। পরবর্তীতে কোন ব্যবস্থা হয়ে গেলে তারা সেখানে চলে যেতেন। এখানে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণকারীগণ ইতিহাসে 'আহলে ছুফফাহ' বা 'আছহাবে ছুফফাহ' নামে খ্যাতি লাভকরেন। বিখ্যাত হাদীছবেত্তা ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এখানকার অন্যতম সদস্য ও দায়িত্বশীল ছিলেন। যিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগে বাহরায়েন এবং মু'আবিয়া (রাঃ) ও মারওয়ানের সময় একাধিকবার মদীনার গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি ৫৭হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ৩৪৪

৩৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, ক্রমিক সংখ্যা ১২১৬, ১২/২৮৮ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৭৭; মিশকাত হা/৮৩৯। যে সকল বিদ্বান আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে 'গায়ের ফক্বীহ' বলেন, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন। কেননা ঐরূপ কোন ব্যক্তি গবর্ণরের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন হ'তে পারেন না। যেমন হানাফী উছুলে ফিক্বহ বা
ইজতিহাদে অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হন, যেমন চার খলীফা ও চার আব্দুল্লাহ, তাহ'লে তাঁর হাদীছ দলীল হিসাবে গণ্য হবে এবং সে অবস্থায় কিয়াস পরিত্যক্ত হবে।... আর যদি ফিক্বহ ব্যতীত কেবল ন্যায়নিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ স্মৃতির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হন, যেমন আনাস ও আবু হুরায়রা; যদি তাঁর হাদীই কিয়াসের অনুকূলে হয়, তাহ'লে তার উপরে আমল করা যাবে। আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা যাবে না বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত' (আহমাদ মোল্লা জিয়ূন (মৃ. ১১৩০ হি.), নূরুল আনওয়ার (দেউবন্দ মাকতাবা থানবী, ইউপি, ভারত এপ্রিল ১৯৮৩) 'রাবীদের প্রকারভেদ' অধ্যায়, 'রাবীর অবস্থা সমূহ' অনুচ্ছেদ ১৮২-৮৩ পৃঃ)। এ কথার প্রতিবাদ করেন হেদায়ার ভাষ্যকার প্রখ্যাতঅনেক সময় মদীনার ছাহাবীগণও 'যুহদ' ও দনিয়াত্যাগী জীবন যাপনের জন্য তাদের মধ্যে এসে বসবাস করতেন। যেমন কা'ব বিন মালেক আনছারী, হানযালা বিন আবু 'আমের 'গাসীলুল মালায়েকাহ', হারেছাহ বিন নু'মান আনছারী প্রমুখ। চাতালটি যথেষ্ট বড় ছিল। কেননা এখানে যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের ওয়ালীমা খানায় প্রায় তিনশ'র মত মানুষ )( জমা হয়েছিলেন (৪৫ তাদের সংখ্যা কম-বেশী হ'ত। তবে সাধারণতঃ সর্বদা ৭০ জনের মত থাকতেন।

কখনো অনেক বেড়ে যেত। খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) একবার তাদের মধ্যে থেকে একাই আশি জনকে মেহমানদারী করেছিলেন।

সংখ্যা )( : আবু নু'আইম তাঁর 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে আছহাবে ছুফফার একশ'র অধিক নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, হযরত আবু হুরায়রা দাওসী, আবু যার গিফারী আনছারী, যিনি স্বেচ্ছায় সেখানে অবস্থান করতেন। ওয়াছেলা বিন আসক্বা', কা'ব বিন মালেক, সালমান ফারেসী, হানযালা বিন আবু 'আমের, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, রিফা'আহ আবু লুবাবাহ আনছারী, আব্দুল্লাহ যুল-বাজাদাইন, খাব্বাব ইবনুল আরাত, আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ, ছুহায়েব বিন সিনান রূমী, রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস শুকুরান, সাফীনাহ ও ছাওবান। বেলাল বিন রাবাহ, ইরবায বিন সারিয়াহ, আবু সাঈদ খুদরী প্রমুখ।

আছহাবে ছুফফাহর সদস্যগণ অধিকাংশ সময় ই'তিকাফ, ইবাদত ও তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন ও লেখা-পড়া শিখাতেন। তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন বিষয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। যেমন আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ফিৎনা সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে।অধিকাংশ সময় সমাজ থেকে দূরে থাকলেও তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি শহীদ হয়েছেন। যেমন বদরে শহীদদের মধ্যে ছিলেন ছাফওয়ান বিন বায়যা, খুরাইম বিন ফাতেক আসাদী, খোবায়ের বিন ইয়াসাফ, সালেম বিন উমায়ের প্রমুখ। ওহোদের শহীদদের মধ্যে ছিলেন হানযালা 'গাসীলুল মালায়েকাহ'। কেউ হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে উপস্থিত ছিলেন। যেমন জারহাদ বিন খুওয়াইলিদ, আবু সারীহাহ গিফারী। তাদের মধ্যে কেউ খায়বরে শহীদ হয়েছিলেন। যেমন ছাকুফ বিন আমর। কেউ তাবুকে শহীদ হয়েছিলেন। যেমন আব্দুল্লাহ যুল বাজাদায়েন। কেউ ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্র যুদ্ধে শহীদ হন। যেমন আবু হুযায়ফাহর মুক্তদাস সালেম ও যায়েদ ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা ছিলেন রাতের বেলা ইবাদত গুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার।

তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআনে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যেমন সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত ও সূরা তওবাহ ৯১ আয়াত। তাঁদের সম্পর্কে ওয়াক্বেদী, ইবনু

সা'দ, আবু নাঈম, তাক্বিউদ্দীন সুবকী, সামহূদী প্রমুখ বিদ্বানগণ পৃথক পৃথক গ্রন্থ সংকলন করেছেন (সীরাহ ছহীহাহ ১/২৫৭-৭১)। আয়াত দু'টি নিম্নরূপ:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

'তোমরা ব্যয় কর ঐসব অভাবীদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণে সক্ষম নয়। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দার মত প্রার্থী হয় না। আর তোমরা উত্তম মাল হ'তে যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যকভাবে অবহিত' (বাক্বারাহ ২/২৭৩)।

দ্বিতীয় আয়াতটি হ'ল,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

নেই দুর্বলদের উপর, রোগীদের উপর ও ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খালেছ ঈমান রাখে। বস্তুতঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (তওবাহ ৯/৯১)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস বিন মালেকের গৃহে আনছার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ৯০ জন ব্যক্তির এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক আহ্বান করেন। যেখানে উভয় দলের অর্ধেক অর্ধেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পরস্পর দু'জনের মধ্যে ইসলামী) বন্ধন স্থাপন করেন এই শর্তে যে, 'তারা একে অপরের দুঃখ-বেদনার সাথী হবেন এবং মৃত্যুর পরে পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন'।

তবে উত্তরাধিকার লাভের শর্তটি ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর অবর্তীর্ণ আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। যেখানে বলা হয়, 'রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়গণ আল্লাহ্ কিতাবে

পরস্পরের অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞাত' (আনফাল ৮/৭৫)। এর ফলে উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি রহিত হ'লেও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অটুট এবং অনন্য। বিশ্ব ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এই ঘটনা ১ম হিজরী সনেই ঘটেছিল মসজিদে নববী নির্মাণকালে অথবা নির্মাণ শেষে। তবে ঠিক কোন তারিখে ঘটেছিল, সেটা সঠিকভাবে জানা যায় না। ইবনু আব্দিল বার এটিকে হিজরতের ৫ মাস পরে বলেছেন। ইবনু সা'দ এটিকে হিজরতের পরে এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে বলেছেন (সীরাহ ছহীহাহ ১/২৪৩)। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

ভ্রাতৃত্বের নমুনা ঃ( :

(১) আব্দুর রহমান বিন 'আওফ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাজির আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে আনছার সা'দ বিন রবী'-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। অতঃপর সা'দ তার মুহাজির ভাইকে বললেন, 'আনছারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আপনি আমার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে আপনি পসন্দ করেন, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিবাহ করবেন'। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে দো'আ করলেন, 'আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন'! আপনি আমাকে আপনাদের বাজার দেখিয়ে দিন। অতঃপর তাঁকে বনু ক্বায়নুক্বা-র বাজার দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি সেখানে গিয়ে পনীর ও ঘি-এর ব্যবসা শুরু করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সচ্ছলতা লাভ করলেন। এক সময় তিনি বিয়ে-শাদীও করলেন।

।২) খেজুর বাগান ভাগ করে দেবার প্রস্তাব: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

আনছারগণ একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে আবেদন করলেন যে, আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলি আমাদের ও মুহাজির ভাইগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন তারা বললেন, তবে এমন করুন যে, মুহাজির ভাইগণ আমাদের কাজ করে দিবেন এবং আমরা তাদের ফলের অংশ দিব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে সম্মত হ'লেন (বুখারী হা/৩৭৮২)।

(৩) জমি বণ্টনের প্রস্তাব: বাহরায়েন এলাকা বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

সেখানকার পতিত জমিগুলি আনছারদের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে চাইলে তারা আপত্তি করে বললেন, আমাদের মুহাজির ভাইদের উক্ত পরিমাণ জমি দেওয়ার পরে আমাদের দিবেন। তার পূর্বে নয়। ৩৪৮ আনছারদের এই অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের প্রশংসা করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন (হাশর ৫৯/৯)। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

:

মুহাজির ভাইদের জন্য আনছারগণের সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যার মাধ্যমে বংশ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা প্রভৃতি আরবের চিরাচরিত বন্ধন সমূহের উপরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক নবতর এক জাতীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়। যা পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ভিত্তিক ইসলামী খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তি। উপ্ত হয় প্রকৃত অর্থে এক অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক ইসলামী সমাজের বীজ।

'আল্লাহ্ দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান'- এই মহান সাম্যের বাণী ও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখে আজীবন মানুষের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ মযলুম জনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিগৃহীত ও শোষিত মানবতা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় সর্বোত্তমরূপে বিকশিত মানবতা মদীনার আদি বাসিন্দাদের চমকিত করল। যা তাদের স্বার্থান্ধ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নোংরা দুনিয়াপূজা হ'তে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতমুখী মানুষের বিজয় মিছিল এগিয়ে চলল। কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাছারা ও মুনাফিকদের যাবতীয় অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফত। যা কয়েক বছরের মধ্যেই তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে দমিত করে অপরাজেয় বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত হ'ল। ফালিল্লা-হিল হামদবস্তুতঃ আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যদি এইরূপ নিখাদ ভালবাসা ও ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি না হ'ত এবং স্থানীয় ও বহিরাগত দ্বন্দ্বের ফাটল দেখা দিত,

তাহ'লে মদীনায় মুসলমানদের উঠতি শক্তি অংকুরেই বিনাশ হয়ে যেত। পরিণামে তাদেরকে চিরকাল ইহুদীদের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হ'তে হ'ত। যেভাবে ইতিপূর্বে মক্কায় কুরায়েশ নেতাদের হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

## ইসলামে জিহাদ বিধান

কুরায়েশদের সন্ত্রাসমূলক অপতৎপরতা ও প্রকাশ্য হামলাসমূহ মুকাবিলার জন্য মুসলমানদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ইতিপূর্বে হিজরতকালে সূরা হজ্জ ৩৯ ও ৪০ আয়াত নাযিল হয় যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে হিজরতকালে নাযিল হয়। ৩৫০ আর জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ থেকে যুলুম ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তালুত কর্তৃক অত্যাচারী বাদশাহ জালুতের ধ্বংস প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ একজনকে আরেকজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই করুণাময়' (বাক্বারাহ ২/২৫১)।

ইসলামে জিহাদ বিধান )( :

'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শারঈ পরিভাষায় 'জিহাদ' হ'ল সমাজে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যার চূড়ান্ত রূপ। জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

(ক) মাক্কী জীবনে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। বলা হয়েছিল, কর ও যাকাত প্রদান কর'... (নিসা ৪/৭৭)। এই নীতি সর্বদা প্রযোজ্য। যখন কুফরী শক্তি প্রবল হবে এবং ইসলামী শক্তি তার তুলনায় দুর্বল থাকবে।

(খ) অতঃপর দেশ থেকে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মত চূড়ান্ত যুলুমের অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে। বলা হয়, 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) সাহায্য করতে সক্ষম' (হাজ্জ ২২/৩৯)।

গ) এ সময় কেবল যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং এতে বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' (বাক্বারাহ ২/১৯০)। অর্থাৎ স্রেফ পরকালীন স্বার্থেই জিহাদ হবে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয় এবং যারা যুদ্ধ করে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে।

(ঘ) যুদ্ধকালে নির্দেশ দেওয়া হয় -

আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ কর, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না'। ৩৫১

(ঙ) অতঃপর কুফরী শক্তির সর্বব্যাপী হামলা থেকে দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে মৌলিক আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেৎনার

(কুফরীর) অবসান হয় এবং আনুগত্য স্রেফ আল্লাহ্ জন্য হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে যালেমদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেই' (বাক্বারাহ ২/১৯৩: আনফাল ৮/৩৯)।

(চ) সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় 'তাওহীদের ঝাণ্ডা উঁচু থাকবে ও শিরকের ঝাণ্ডা অবনমিত হবে' মর্মে জিহাদের চিরন্তন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

কাফেরদের (শিরকের) ঝাণ্ডা অবনত করে দিলেন ও আল্লাহ্র (তাওহীদের) ঝাণ্ডা

সমুন্নত রাখলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' (তওবা ৯/৪০)।

(ছ) যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং আল্লাহর দ্বীনকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, সেইসব কাফের অপশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। যেমন আল্লাহ বলেন, ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন। যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করে না'। 'তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না' (ছফ ৬১/৮-৯; তওবাহ ৯/৩২)।

(জ) কোন মুসলিম যদি কুফরী শক্তির দোসর হিসাবে কাজ করে, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে 'কঠোর' হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِير কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হও। ওদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর কতইনা মন্দ ঠিকানা সেটি' (তওবা ৯/৭৩: তাহরীম ৬৬/৯)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে।

(ঝ) মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। ২৩ কোন কারণে যুদ্ধ লাগলে অন্যদের দায়িত্ব হবে উভয় পক্ষকে থামানো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া' (হুজুরাত ৪৯/৯)। নইলে বিরত থাকা। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন'। লোকেরা বলল, আল্লাহ কি কর, যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' )বাক্বারাহ ২/১৯৩)। জবাবে তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছি যাতে ফিৎনা (শিরক ও কুফর) না থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ জন্য হয়ে যায়। আর তোমরা যুদ্ধ করছ যাতে ফিৎনা (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের)শত্রুর) জন্য হয়ে যায়' (বুখারী হা/৪৫১৩)। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন । 'তুমি কি জানো ফিৎনা কি? মুহাম্মাদ (ছাঃ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ নয়' (বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫)।

হবে। তখন তোমাদের মধ্যেকার ধ্যেকার বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং বসা ব্যক্তি হাঁটা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর হাঁটা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যদি কেউ আশ্রয়স্থল বা বাঁচার কোন স্থান পায়, তবে সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়'। ৩০৪ ফিৎনার সময় করণীয় প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি আদমের পুত্রের মত হও' (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন'। যেখানে হত্যাকারী ক্বাবীলের বিরুদ্ধে হাবীলের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি' (মায়েদাহ ৫/২৮)।৩৫৫ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যখন তোমাদের কারু গৃহে ফেৎনা প্রবেশ করবে, তখন সে যেন আদমের দুই পুত্রের উত্তমটির ()

বিশ্বজয়ী লক্ষ্য )( : বিশ্বব্যাপী কুফরী শক্তিকে অবনত করে

তাওহীদকে সমুন্নত করা ও মানুষকে শয়তানী শাসন ও যুলুমের শৃংখলমুক্ত করে আল্লাহর বিধানের অনুগত করাই হ'ল জিহাদের বিশ্বজয়ী লক্ষ্য। যদিও এটি কষ্টকর। কিন্তু এটি আল্লাহ মুসলমানের উপর ফরয করেছেন মানবতার মুক্তির জন্য এবং বিশ্বে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেন, লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম করেনা ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' (বাক্বারাহ ২/২৪০০ ওওবাহ ৯/২৯)।

অবশ্যই এ জিহাদ কেবল অস্ত্রশক্তি দিয়ে নয়। বরং তা হবে মূলতঃ দ্বীনের শক্তি দিয়ে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তিপূর্ণ দলীল দ্বারা আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে। যাকে 'চিন্ত র যুদ্ধ' )( বলা হয়। আর এটাই হ'ল দ্রুত ও স্থায়ীভাবে কার্যকর। আর এর মাধ্যমেই আসে সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লব। ইসলামী জিহাদের এটাই হ'ল চূড়ান্ত লক্ষ্য। জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। জিহাদকে ইসলামের চূড়া( ) বলা হয়েছে'। ৩০৭ আর চূড়া না থাকলে ঘর থাকেনা। যে ব্যক্তি কুফরী আদর্শের সঙ্গে আপোষ করে এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের আকাংখাও হৃদয়ে পোষণ করে না, সে ব্যক্তি মুনাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল'। সেকারণ জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। এতে যুদ্ধের ময়দানে এমনকি বিছানায় মরলেও সে শহীদ হধে'। *** জিহাদ ব্যতীত মুসলমান তার জান-মাল ও ইয্যত নিয়ে দুনিয়ায় সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারে না এবং আখেরাতেও মুক্তি পেতে পারে না।

বস্তুতঃ জিহাদ হয়ে থাকে সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েমের মাধ্যমে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেন,

প্রস্তুত করেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও বিশৃংখলা কামনা করেনা। আরশুভ পরিণাম হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য' (ক্বাছাছ ২৮/১৮৩)। বাস্তবিক পক্ষে ডিয়াসৎ

-১১০. 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যানের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে' (আলে-ইমরান ৩/১১০)।

মুসলমান বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হবে। যা তরবারীর জোরে নয় বরং প্রতিষ্ঠিত হবে বস্তুতঃ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তার অন্তর্নিহিত তাওহীদী চেতনার অজেয় শক্তির জোরে। একদিন যা পৃথিবীর সবল প্রান্তে মাটির ঘরে ও গরীবের পর্ণকুটিরেও প্রবেশ করবে। সম্মানিত ব্যক্তির ঘরে (ইসলাম কবুলের মাধ্যমে) সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানিত ব্যক্তির ঘরে (জিযিয়া

প্রদানের মাধ্যমে) অসম্মানের সাথে'। ৩০০ (বিস্তারিত পাঠ করুন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)।

মদীনায় হিজরতের পর সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দানের কারণ ছিল তিনটি।-

(১) মুসলমানেরা ছিল মযলূম এবং হামলাকারীরা ছিল যালেম।

(২) মুহাজিরগণ ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত এবং তাদের মাল-সম্পদ ছিল লুণ্ঠিত। তারা ছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত, স্রেফ তাওহীদী আক্বীদার কারণে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয় (হজ্জ ২২/৪০)।

(৩) মদীনা ও আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধি চুক্তি ছিল। যাতে পরস্পরের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এক্ষণে মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা মুসলমানদের সহযোগী হওয়ার কারণে যদি তাদের উপরে হামলা করা হয়, তাহ'লে সন্ধিচুক্তি রক্ষার স্বার্থে তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে যালেমদের হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়াটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল।

জিহাদের অনুমতি লাভের পর ১ম হিজরীর রামাযান মাস থেকে কুরায়েশদের হামলা প্রতিরোধে মদীনার বাইরে নিয়মিত সশস্ত্র টহল অভিযান সমূহ প্রেরিত হ'তে থাকে। অতঃপর ২য় হিজরীর রজব মাসে নাখলা যুদ্ধের পর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে নিয়মিতভাবে জিহাদ ফরয করা হয় এবং উক্ত মর্মে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

## অভিযান ও যুদ্ধসমূহ

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের পর কুরায়েশ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী রাস্তাগুলিতে নিয়মিত টহল অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর কৃত সন্ধি চুক্তিসমূহ খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। যার এলাকাসমূহ মদীনা হ'তে মক্কার দিকে তিন মনযিল অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব অভিযানের যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ )ছাঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, সেগুলিকে 'গাযওয়াহ' এবং যেগুলিতে নিজে যেতেন না, বরং অন্যদের পাঠাতেন, সেগুলিকে সারিইয়াহ বলা হয়। এইসব অভিযানে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে বের হ'লেও বলতে গেলে কোনটাতেই যুদ্ধ হয়নি। তবে মক্কায় খবর হয়ে গিয়েছিল যে, কুরায়েশদের হুমকিতে মুহাজিরগণ ভীত নন, বরং তারা সদা প্রস্তুত।

উল্লেখ্য যে, সকল অভিযানেই পতাকা থাকতো সাদা রংয়ের এবং পতাকাবাহী সেনাপতি থাকতেন পৃথক ব্যক্তি। এক্ষণে এই সময়ের মধ্যে প্রৈরিত অভিযান সমূহ বিবৃত হ'ল, যা নিম্নরূপ।-

**১. সারিইয়া সায়ফুল বাহ্ বা সমুদ্রোপকূলে প্রেরিত বাহিনী :** ১ম হিজরী সনের রামাযান মাস (মার্চ ৬২৩ খৃ.)। হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয় সিরিয়া হ'তে আবু জাহলের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০০ সদস্যের কুরায়েশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। উভয় বাহিনী মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' নামক স্থানে

মুখোমুখি হয়। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী বিন আমর, যিনি ছিলেন উভয় দলের মিত্র, তাঁর কারণে যুদ্ধ হয়নি। এ যুদ্ধে পতাকা বাহক ছিলেন আবু মারছাদ আল-গানাভী (রাঃ)।

**২. সারিইয়া রাবেগ** : ১ম হিজরীর শাওয়াল মাস। ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ বিন মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। মদীনা থেকে দক্ষিণে এবং জেদ্দা থেকে ১৪০ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত 'রাবেগ' অঞ্চলটি বর্তমানে মক্কা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই অভিযানে রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জনের এক বাহিনীর মুখোমুখি হ'লে উভয় পক্ষে কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে মাক্কী বাহিনী থেকে দু'জন দল ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীতে চলে আসেন। যারা গোপনে মুসলমান ছিলেন। যাদের একজন হ'লেন মিকুদাদ বিন 'আমরএবং অন্যজন হ'লেন উৎবাহ বিন গাযওয়ান। এই যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) কাফেরদের প্রতি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। সেকারণ তিনি 'আরবদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো'আ কবুল কর'। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিসত্বাহ বিন আছাছাহ বিন মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

**৩. সারিইয়া খাররার** : ১ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০ জনের এই মুহাজির দল প্রেরিত হয় কুরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তারা জুহফার নিকটবর্তী 'খাররার' উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। কেননা মক্কার কাফেলা এখান থেকে একদিন আগেই চলে গিয়েছিল। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিকুদাদ বিন 'আমর (রাঃ)। ৩৬৫

**৪. গাযওয়া ওয়াদ্দান** :২য় হিজরীর ছফর মাস (আগষ্ট ৬২৩ খৃঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম এই অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেন, যাতে ৭০ জন মুহাজির ছিলেন। মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণে এই অভিযানে তিনি ১৫ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন এবং যাওয়ার সময় খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলার পথ রোধ করা। কিন্তু বাস্তবে

তাদের দেখা মেলেনি। তবে এই সফরে লাভ হয় এই যে, তিনি স্থানীয় বনু যামরাহ গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন (ইবনু হিশাম ১/৫৯১)। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

**৫. গাযওয়া বুওয়াত্ব :** ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস (সেপ্টেম্বর ৬২৩ খৃঃ)। ২০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এ অভিযানে বের হন। মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০ কি.মি. দূরে এটি অবস্থিত। উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে ১০০ জনের কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সংঘর্ষ হয়নি। এই অভিযানে বের হওয়ার সময় তিনি আউস নেতা সা'দ বিনমু'আয (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন সা'দ বিন আবু ওয়াকক্কাছ (রাঃ)। ৩৬৭

**৬. গাযওয়া সাফওয়ান :** একই মাসে মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী মদীনার চারণভূমি থেকে গবাদিপশু লুট করে নিয়ে গেলে ৭০ জন ছাহাবীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু লুটেরাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এই অভিযানকে অনেকে গাযওয়া বদরে উলা বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় মদীনার আমীর ছিলেন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল মদীনার উপকণ্ঠে কুরায়েশদের প্রথম হামলা। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রাঃ)।

**৭. গাযওয়া যুল-'উশাইরাহ :**

২য় হিজরীর জুমাদাল উলা ও আখেরাহ মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। ১৫০ বা ২০০ ছাহাবীর একটি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মূল্যবান রসদবাহী কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধে বের হন। কিন্তু ইয়াম্বু'-এর পার্শ্ববর্তী যুল-'উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও তাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন আবু সালামাহ (রাঃ)। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই কুরায়েশ কাফেলাটি বহাল তবিয়তে মক্কায় ফিরে যায় এবং এর ফলেই বদর যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়। এই অভিযানকালে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্রদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

**৮. সারিইয়া নাখলা :**

২য় হিজরীর রজব মাস (জানুয়ারী ৬২৪ খৃঃ)।

আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে ৮ বা ১২ জন মুহাজির ছাহাবীর একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধে প্রেরণের সময় রাসূল (ছাঃ) তার হাতে একটি পত্র দেন এবং বলেন, দু'দিন পথ চলার আগ পর্যন্ত যেন পত্রটি না খোলা হয়। দু'দিন চলার পর তিনি পত্র খোলেন এবং পাঠ করার পর সবাইকে বলেন, আমাদেরকে ত্বায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নাখলায় অবতরণ করতে বলা হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে কুরায়েশ কাফেলার অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। অতএব যিনি শহীদ হ'তে চান কেবল তিনিই আমার সাথে যাবেন। অথবা ইচ্ছা করলে ফিরে যাবেন। এ ব্যাপারে আমি কাউকে চাপ দিব না তবেআমি যেতে প্রস্তুত'। তখন সাথী মহাজিরগণের সবাই তাঁর সঙ্গে থাকলেন, কেউই ফিরে আসলেন না। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্যে ছিলেন আমীর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ছাড়াও সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা বিন রাবী'আহ, উক্কাশা বিন মিহছান, উৎবা বিন গাযওয়ান, ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন বুকাইর ও সোহায়েল বিন বায়যা' প্রমুখ ।

অতঃপর তাঁরা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে একটি কুরায়েশ কাফেলাকে আক্রমণ করেন ও তাদের নেতা আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করে দু'জন বন্দী সহ গণীমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গণীমত লাভ এবং প্রথম নিহত হওয়ার ঘটনা ও প্রথম দু'ব্যক্তি বন্দী হওয়ার ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে রজব মাসের শেষ দিনে। কেননা তারা দেখলেন যদি আমরা যুদ্ধ না করি, তাহ'লে শত্রু পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের মুক্তি দেন ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তমূল্য দেন। এ সময় মুসলমানেরা হারাম মাসের বিধান লংঘন করেছে বলে মুশরিকদের রটনার জবাবে সূরা বাক্বারাহ ২১৭ আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে বলা হয়,

فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى

يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

'লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে নিষিদ্ধ মাস ও তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। তুমি বল, এ মাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ। তবে আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করা ও তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া ও তার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকটে আরও বড় পাপ। আর ফিৎনা (কুফরী) করা যুদ্ধ করার চাইতে বড় পাপ। বস্তুতঃ যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে' (বাক্বারাহ ২/২১৭)। অর্থাৎ মুসলমানদের এই কাজের তুলনায় মুশরিকদের অপকর্মসমূহ ছিল বহু গুণ বেশী অপরাধজনক। এই যুদ্ধে নিহতের বদলা নিতেই আবু জাহল বদরে যুদ্ধ করতে এসেছিল। এই অভিযান শেষে শা'বান মাসে মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ হয়।

## ক্বিবলা পরিবর্তন

নাখলা অভিযান শেষ হবার পর ২য় হিজরীর শা'বান মাসে (ফেব্রুয়ারী ৬২৪ খৃ.) ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ সূচক আয়াতটি (বাক্বারাহ ২/১৪৪) নাযিল হয়। যাতে ১৬/১৭ মাস পরে বায়তুল মুক্বাদ্দাস হ'তে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হুকুম নাযিলের মাধ্যমে কপট ইহুদীদের মুখোশ খুলে যায়। যারা মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়েছিল স্রেফ ফাটল ধরানো ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য। এখন তারা তাদের নিজস্ব অবস্থানে ফিরে গেল এবং মুসলমানেরাও তাদের কপটতা ও খেয়ানত থেকে বেঁচে গেল। একই সময়ে রামাযানের ছিয়াম ও যাকাতুল ফিত্র ফরয করা হয়।

ইঙ্গিত ছিল যে, এখন থেকে একটি নতুন যুগের সূচনা হ'তে যাচ্ছে, যা ফেলে আসা ক্বিবলা কা'বাগৃহের উপরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একই সময়ে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ যে স্থান হ'তে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, সে স্থান হ'তে তোমরাও তাদের বহিষ্কার কর'। অতঃপর যুদ্ধের নিয়মবিধি নাযিল হয় সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ আয়াতে। অতঃপর যুদ্ধ ভয়ে ভীতু কাপুরুষদের নিন্দা করে একই সূরার ২০ আয়াতটি নাযিল হয়। একই সময়ে পরপর এসব আয়াত নাযিলের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, হক ও বাতিলের মধ্যে একটা চূড়ান্ত বুঝাপড়ার সময়কাল অত্যাসন্ন। কেননা আল্লাহ কখনোই চান না যে, তাঁর পবিত্র গৃহ নাপাক মুশরিক ও পৌত্তলিকদের দখলীভুক্ত হয়ে থাকুক। বলা বাহুল্য ক্বিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিলের পর রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মধ্যে আশা ও আনন্দের ঢেউ জেগে ওঠে এবং তাদের অন্তরে মক্কায় ফিরে যাওয়ার আকাংখা ও উদ্দীপনা তীব্র হয়ে ওঠে, যা উক্ত ঘটনার দেড় মাস পরে বদর যুদ্ধে তাদেরকে বিজয়ী হ'তে সাহায্য করে।

## বদর যুদ্ধ

হিজরতের অনধিক ১৯ মাস পর ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে (৬২৪ খৃ. ১১ই মার্চ) ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩৭৩ এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছারসহ মোট ১৪ জন শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয় ()। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

বদর হ'ল মদীনা থেকে ১৬০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম। যেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। এখানেই সংঘটিত হয় ইসলামের ইতিহাসে তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার প্রথম সশস্ত্র মুকাবিলা। ১৯ মাসের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনা থেকে বের করে দেবার জন্য নানাবিধ অপচেষ্টা চালায়। যেমনভাবে তারা ইতিপূর্বে হাবশায়

হিজরতকারী মুসলমানদের সেখান থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে। (১) সেখানে ছিল একজন ধর্মপরায়ণ খ্রিষ্টান বাদশাহ আছহামা নাজাশীর রাজত্ব। যিনি নিজে ইনজীলে পণ্ডিত ছিলেন এবং সেকারণে আখেরী নবী হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (২) মক্কা ও হাবশার মধ্যখানে ছিল আরব সাগরের একটি প্রশস্ত শাখা। যা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে হামলা করা সম্ভব ছিল না। (৩) হাবশার লোকেরা ছিল হিব্রুভাষী। তাদের সাথে কুরায়েশদের ভাষাগত মিল ছিল না এবং কোনরূপ আত্মীয়তা বা পূর্ব পরিচয় ছিল না। ধর্ম ও অঞ্চলগত মিলও ছিল না।

পক্ষান্তরে ইয়াছরিব ছিল কুরায়েশদের খুবই পরিচিত এলাকা। যার উপর দিয়ে তারা নিয়মিতভাবে সিরিয়াতে ব্যবসার জন্য যাতায়াত করত। তাছাড়া তাদের সঙ্গে ভাষাগত মিল এবং আত্মীয়তাও ছিল। অধিকন্তু রাস্তা ছিল স্থলপথ, যেখানে নদী-নালার কোন বাধা নেই। দূরত্ব বর্তমানের হিসাবে প্রায় ৪৬০ কিলোমিটার হ'লেও সেখানে যাতায়াতে তারা অভ্যস্ত ছিল। এক্ষণে আমরা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরোক্ষ কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করব।-

**পরোক্ষ কারণ সমূহ**

মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের পত্র প্রেরণ। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ তখনও ইসলাম কবুল করেননি। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের কারণে ইয়াছরিবের নেতৃত্ব লাভের মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তিনিছিলেন মনে মনে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি তার এই ক্ষোভটাকেই কুরায়েশরা কাজে লাগায় এবং নিম্নোক্ত ভাষায় কঠোর হুমকি দিয়ে তার নিকটে চিঠি পাঠায়।-

'তোমরা আমাদের লোকটিকে (মুহাম্মাদকে) আশ্রয় দিয়েছ। এজন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, হয় তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও তাকে বের করে দিবে নতুবা আমরা তোমাদের উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করব। তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব ও নারীদের হালাল করব'।

এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দ্রুত তার সমমনাদের সাথে গোপন বৈঠকে বসে গেল। কিন্তু সংবাদ রাসূল (ছাঃ)-এর কানে পৌঁছে গেল। তিনি সরাসরি তাদের বৈঠকে এসে হাযির হ'লেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি দেখছি কুরায়েশদের হুমকিকে তোমরা দারুণভাবে গ্রহণ করেছ। অথচ এর মাধ্যমে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছ, কুরায়েশরা তোমাদের সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। 'তোমরা কি তোমাদের সন্তান ও ভাইদের সাথে (অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে) যুদ্ধ করতে চাও'? রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে এ বক্তব্য শুনে বৈঠক ভেঙ্গে গেল ও দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ৩৭৫ যদিও আব্দুল্লাহ্র অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকল। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুনাফিক ও ইহুদীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে থাকেন। যাতে হিংসার আগুন জ্বলে না ওঠে।

## (২) আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)

ওমরাহ করার জন্য মক্কায় যান ও কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের অতিথি হন। উমাইয়ার ব্যবস্থাপনায় দুপুরে নিরিবিলি তাওয়াফ করতে দেখে আবু জাহল তাকে ধমকের সুরে বলেন,

তোমাকে দেখছি মক্কায় বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করছ।

অথচ তোমরা ধর্মত্যাগী লোকগুলোকে আশ্রয় দিয়েছ!... আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি আবু ছাফওয়ানের (উমাইয়া বিন খালাফের) সাথে না থাকতে, তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না'। একথা শুনে সা'দ চীৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি আমাকে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তোমার জন্য এর চেয়ে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়াবো। আর তাতে মদীনা হয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের রাস্তা বন্ধ হবে'।

৩) কুরায়েশ নেতারা ও তাদের দোসররা হর-হামেশা তৎপর ছিল মুহাজিরগণের সর্বনাশ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায়ই বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। এক রাতে তিনি বললেন,

যদি আমার সাহাবীগণের মধ্যে যোগ্য কেউ এসে আমাকে রাতে পাহারা দিত'! আয়েশা (রাঃ) বলেন, এমন সময় হঠাৎ অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব এল, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কি উদ্দেশ্যে আগমন? সা'দ বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আমার অন্তরে ভয় উপস্থিত হ'ল। তাই এসেছি তাঁকে পাহারা দেবার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন ও ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমরা তাঁর নাক ডাকানোর শব্দ শুনতে পেলাম'। এরপর থেকে এরূপ পাহারাদারীর ব্যবস্থা নিয়মিত চলতে থাকে। যতক্ষণ না নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল - وَاللهُ

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس 'আল্লাহ তোমাকে লোকদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন' (মায়েদাহ ৫/৬৭)। উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

যাও! মহান আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন'। কুরায়েশদের অপতৎপরতা কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধেই ছিল না; বরং সাধারণ মুহাজির মুসলমানের বিরুদ্ধেও ছিল। আর এটাই স্বাভাবিক।

## বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিরিয়া ফেরত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাদের পুরা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সাঈদ বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। তারা 'হাওরা' (الْحَوْرَاء) নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিরাট এক ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কার পথে সত্বর ঐ স্থান অতিক্রম করবে। যাদেরকে ইতিপূর্বে যুল-'উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও ধরা যায়নি। যে কাফেলায় রয়েছে এক হাযার উট বোঝাই কমপক্ষে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার মাল-সম্পদ এবং তাদের প্রহরায় রয়েছে আমর ইবনুল 'আছ সহ ৩০ থেকে ৪০ জন সশস্ত্র জোয়ান। উল্লেখ্য যে, এই বাণিজ্যে মক্কার সকল নারী-পুরুষ অংশীদার ছিল। তারা দ্রুত মদীনায় ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে এই খবর দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তা করলেন, এই বিপুল সম্পদ মক্কায় পৌঁছে গেলে তার প্রায় সবই ব্যবহার করা হবে মদীনায় মুহাজিরগণকে

ধ্বংস করার কাজে । অতএবার মোটেই কালকে ফোন না করে তিনি তখনই বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই কাফেলাকে আটকানোর জন্য

## বদর যুদ্ধের বিবরণ

বিগত অভিযানগুলির ন্যায় এ অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলাকে আটকানো। তাই অন্যান্য অভিযানের মতই এটাকে ভাবা হয়েছিল। ফলে কেউ যোগ দিয়েছিল, কেউ দেয়নি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে অভিযানে যেতে বাধ্য করেননি। অবশেষে ৮ই রামাযান সোমবার অথবা ১২ই রামাযান শনিবার ৩১৩, ১৪ বা ১৭ জনের একটি কাফেলা নিয়ে সাধারণ প্রস্তুতি সহ তিনি রওয়ানা হ'লেন। যার মধ্যে ৮২, ৮৩ অথবা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকীগণ ছিলেন আনছার। আনছারগণের মধ্যে ৬১ জন ছিলেন আউস এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। ৩৮০ বি'রে সুকুইয়া নামক স্থানে এসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কায়েস বিন আবু ছা'ছা'আহকে সংখ্যা গণনা করতে বললেন। পরে সংখ্যা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং বললেন, তালূতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল'। ৩৮১ তিন শতাধিক লোকের এই বাহিনীতে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম ও মিকুদাদ ইবনুল আসওয়াদের এবং ৭০টি উট ছিল। যাতে দু'তিন জন করে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে চলতে হ'ত। রাসূল (ছাঃ), আলী ও আবু লুবাবাহ এবং পরবর্তীতে তার বদলে মারছাদ বিন আবু মারছাদ গানাভীর জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল। যাতে পায়ে হাঁটার পালা আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজেও হাঁটতেন। এ সময় মদীনার আমীর নিযুক্ত হন অন্ধ ছাহাবী

আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)।

## যুদ্ধ শুরু

২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে যুদ্ধ শুরু হয় (ইবনু হিশাম ১/৬২৬)। ইতিমধ্যে কুরায়েশ পক্ষের জনৈক হঠকারী আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখযুমী

দৌড়ে এসে বলল, আমি এই হাউয থেকে পানি পান করব অথবা একে ভেঙ্গে ফেলব অথবা এখানেই মরব'। তখন হামযা (রাঃ) এসে তার পায়ে আঘাত করলেন। এমতাবস্থায় সে পা ঘেঁষতে ঘেঁষতে হাউযের দিকে এগোতে লাগল। হামযা তাকে দ্বিতীয় বার আঘাত করলে সে হাউযেই মরে পড়ল ও তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল। এরপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ পক্ষ মুসলিম পক্ষের বীর যোদ্ধাদের দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করল। তাদের একই পরিবারের তিনজন সেরা অশ্বারোহী বীর উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ এবং অলীদ বিন উৎবা এগিয়ে এল। জবাবে মুসলিম পক্ষ হ'তে মু'আয ও মু'আব্বিয বিন 'আফরা কিশোর দুই ভাই এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাসহ তিনজন আনছার তরুণ বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুরায়েশ পক্ষ বলে উঠলো হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমকক্ষদের পাঠাও'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে ওবায়দাহ, হে হামযাহ, হে আলী তোমরা যাও। অতঃপর আলী তার প্রতিপক্ষ অলীদ বিন উৎবাহকে, হামযাহ তার প্রতিপক্ষ শায়বাহ বিন রাবী'আহকে এক নিমিষেই খতম করে ফেললেন। ওদিকে বৃদ্ধ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তার প্রতিপক্ষ উৎবা বিন রাবী'আহর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হ'লেন। তখন আলী ও হামযাহ তার সাহায্যে এগিয়ে এসে উৎবাহকে শেষ করে দেন ও ওবায়দাহকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪র্থ বা ৫ম দিন ওবায়দাহ শাহাদাত বরণ করেন।

প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীর যোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরায়েশ পক্ষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় রাসূল (ছাঃ) শত্রুদের যথাসম্ভব দূরে রাখার জন্য নির্দেশ পড়বে, তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর এবং এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা কর' । অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালু হাতে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, 'চেহারাগুলো বিকৃত হৌক'। ফলে শত্রুবাহিনীর মুশরিকদের এমন কেউ থাকলো না, যার চোখে ঐ বালু প্রবেশ করেনি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য। তাই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি যখন বালু নিক্ষেপ করেছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন'।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর একটি মু'জেযা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তিনি হোনায়েন যুদ্ধেও করেছিলেন। ফারসী কবি বলেন,

'মুহাম্মাদ আরাবী হ'লেন দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার উৎস। কেউ যদি তার পায়ের ধূলা হ'তে না পারে, তার মাথা ধূলি ধূসরিত হৌক!'

মুসলিম নামধারী একদল মুশরিক মা'রেফতী পীর-ফকীর এই ঘটনা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে এবং তারা নিজেদেরকে 'আল্লাহ্র অংশ' বলে থাকে। তাদের দাবী, 'যত কল্লা তত আল্লা'। তারা সূতায় অথবা পাতায় ফুঁক দিলে এবং তা দেহে বাঁধলে বা পকেটে রাখলে শত্রু তাকে দেখতে পাবে না বলে মিথ্যা ধারণা প্রচার করে। এভাবে তারা সরলমনা ও ভক্ত জনগণের ঈমান নষ্ট করে ও সেই সাথে ভক্তির তোরা গলি দিয়ে ভক্তের পকেট সাফ করে।

বালু নিক্ষেপের পর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বাহিনীকে নির্দেশ দেন , ‘তোমরা এগিয়ে চলো জান্নাতের পানে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন পরিব্যপ্ত ' । রাসূল (ছাঃ)-এর এই আহ্বান মুসলমানদের দেহমনে ঈমানী বিদ্যুতের চমক এনে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি আজকে দৃঢ়পদে নেকীর উদ্দেশ্যে লড়াই করবে, পিছপা হবে না, সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হবে, অতঃপর যদি সে নিহত হয়, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।

**ফেরেশতাগণের অবতরণ :**

এ সময় আয়াত নাযিল হ'ল- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْف من - الملائكة مردفين 'যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো'আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে, যারা ধারাবাহিকভাবে অবতরণ করবে' (আনফাল ৮/৯)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা যোগদান করেননি (ইবনু কাছীর)। উল্লেখ্য যে, সূরা আনফাল ৯ আয়াতে 'এক হাযার',

আলে ইমরান ১২৪ ও ১২৫ আয়াতে যথাক্রমে 'তিন হাযার' ও 'পাঁচ হাযার' ফেরেশতা অবতরণের কথা বলা হয়েছে'। এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এক হাযার' সংখ্যাটি তিন হাযার বা তার অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। কেননা উক্ত আয়াতের শেষে مُرْدَفِين শব্দ এসেছে। যার অর্থ 'ধারাবাহিকভাবে আগত'। অতএব আল্লাহ্ হুকুমে যত হাযার প্রয়োজন, তত হাযার ফেরেশতা নাযিল হবে'। ১৭বস্তুতঃ সংখ্যায় বেশী বলার উদ্দেশ্য মুসলিম বাহিনীকে অধিক উৎসাহিত করা এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আবুবকর! তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই যে জিব্রীল, তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন'। অতঃপর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে বললেন, ('সত্বর দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে'-ক্বামার ৫৪/৪৫)।১৯ অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বাইরে এসে আঙ্গুলের ইশারা করে করে বলেন,

এটি অমুকের বধ্যভূমি'। এটি অমুকের, ওটি অমুকের'। রাবী আনাস (রাঃ( বলেন, তাদের কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে যেখানে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইশারা করেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর এই হামলার প্রচণ্ডতার সাথে সাথে যোগ হয় ফেরেশতাগণের আগমন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب .

তোমাদের পালনকর্তা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। অতএব তোমরা ঈমানদারগণের চিত্তকে দৃঢ় রাখো। আমি সত্বর অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কাজেই তোমরা গর্দানের উপর আঘাত হানো এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় মারো'। 'এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার জন্য) কঠিন শাস্তিদাতা' (আনফাল ৮/১২-১৩)। ইকরিমা বিন আবু জাহল (যিনি ঐ যুদ্ধে পিতার সাথে শরীক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হন) বলেন, ঐদিন আমাদের লোকদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেত, অথচ দেখা যেতো না কে মারলো (তাবাক্বাত ইবনু সা'দ)। আবুদাউদ আল-মাযেনী বলেন, আমি একজন মুশরিক সৈন্যকে মারতে উদ্যত হব। ইতিমধ্যে তার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে এসে পড়ল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কে ওকে মারল'। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস যিনি বাহ্যিকভাবে মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন, জনৈক আনছার তাকে বন্দী করে আনলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। বরং যে ব্যক্তি বন্দী করেছে, তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি একজন চুল বিহীন মাথাওয়ালা ও সুন্দর চেহারার মানুষ এবং বিচিত্র বর্ণের একটি সুন্দর ঘোড়ায় তিনি সওয়ার ছিলেন। আনছার যোদ্ধা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিই এনাকে বন্দী করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত আনছারকে : বললেন, 'চুপ কর। আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন' (আহমাদ হা/৯৪৮)। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপরে আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ দিন একজন মুসলিম সেনা তার সম্মুখের মুশরিককে মারতে গেলে শাণিত তরবারির ওঘোড়ার আওয়ায শোনেন। তিনি ফেরেশতার আওয়ায শুনেছেন যে তিনি বলছেন :

হায়যূম আগে বাড়ো' ('হায়যূম' হ'ল ফেরেশতার ঘোড়ার নাম)। অতঃপর ঐ মুশরিক সেনাকে তিনি সামনে চিৎ হয়ে পড়ে যেতে দেখেন। তিনি দেখলেন যে, তরবারির আঘাতের ন্যায় তার নাক ও মুখমণ্ডল বিভক্ত হয়ে গেছে। উক্ত আনছার ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন 'তুমি সত্য বলেছ। ওটি তৃতীয় আসমান থেকে সরাসরি সাহায্যের অংশ'। কেউ কতক ফেরেশতাকে সরাসরি

দেখেছেন। ঐদিন ফেরেশতাদের মাথার পাগড়ী ছিল সাদা। যা তাদের পিঠ পর্যন্ত ঝুলে ছিল। তবে জিব্রীলের মাথার পাগড়ী ছিল হলুদ বর্ণের।

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বস্ত করেছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

তোমাদের নিকটে ফেরেশতা প্রেরণের বিষয়টি ছিল কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃ সাহায্য কেবলমাত্র মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হ'তেই এসে থাকে' (আলে ইমরান ৩/১২৬)।

এর দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলিম বাহিনী যেন এ বিশ্বাস দৃঢ় রাখে যে, ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হয়ে পাশেই আছে। সেজন্য আল্লাহর হুকুমে তারা যৎসামান্য সাহায্য করছে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মনোবলকে বর্ধিত করা, ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো নয়। কেননা তারা সরাসরি জিহাদ করলে মুমিনদের কোন ছওয়াব থাকে না। তাছাড়া সেটা হ'লে তো এক হাযার (আনফাল ৮/৯),

**মাক্কী বাহিনীর পলায়ন:**

মুসলিম বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমণে পর্যুদস্ত মুশরিক বাহিনী প্রাণভয়ে পালাতে থাকল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ধরে রাখার জন্য আবু জাহল তার লোকদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষণ দিয়ে বলেন, সোরাক্কার পলায়নে তোমরা ভেঙ্গে পড়ো না। সে আগে থেকেই মুহাম্মাদের চর ছিল। ওৎবা, শায়বা ও অলীদের মৃত্যুতেও ভীত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা মারা পড়েছেন। লাত ও 'উযযার শপথ করে বলছি, ওদেরকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। অতএব তোমরা ওদেরকে মেরো না। বরং ধরো এবং বেঁধে ফেল'।

কিন্তু আবু জাহলের এই তর্জন-গর্জন অসার প্রমাণিত হ'ল। বর্ষিয়ান ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে আনছারদের বনু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা পৃথকভাবে এসে জিজ্ঞেস করল 'চাচাজী! আবু জাহল-কে দেখিয়ে দিন। সে

নাকি আমাদের রাসূলকে গালি দেয়'? তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে গোপনে এসে চাচাজীর কানে কানে একই কথা বলল। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ বলেন, আমি ওদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। ফলে বাধ্য হয়ে দেখিয়ে দিলাম। তখন ওরা দু'জন তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে মু'আযের একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে হেঁচকা টানে সেটাকে নিজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আউভিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হ'লে তারা উভয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে গর্বভরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ'। অবশ্য এই যুদ্ধে মু'আউভিয বিন 'আফরা পরে শহীদ হন এবং মু'আয বিন 'আফরা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল (২৩-৩৫ হি.) পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

পরে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ গিয়ে দেখেন যে, আবু জাহলের তখনও নিঃশ্বাস চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখলে সে বলে ওঠে, 'তোমরা কি এই ব্যক্তির চাইতে বড় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পেরেছ?' ! 'ওহ্! আমাকে যদি (মদীনার) ঐ চাষাদের বদলে অন্য কেউ হত্যা করতো'! উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) মক্কায় ওকুবা বিন আবু মু'আইত্বের বকরীর রাখাল ছিলেন (আল-বিদায়াহ ৬/১০২)। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইবনু মাসউদ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুন রে আল্লাহর দুশমন!' জবাবে আবু জাহল বলে ওঠে 'কেন তিনি আমাকে লাঞ্ছিত করবেন? আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করেছ কি? এখন বল 'আজ কারা জিতলো'। ইবনু মাসউদ বললেন, 'আজকের জয় আল্লাহ ও তাঁর

রাসূল-এর জন্য'। বলেই তার মাথাটা কেটে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাযির হ'লেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা হ'ল আল্লাহ্র দুশমন আবু জাহলের মাথা। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন 'আল্লাহর কসম? যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। অতঃপর আমি তাঁর সামনে মাথাটি রেখে দিলাম তখন তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। এভাবে মক্কার বড় ত্বাগূতটা শেষ হয়।

**জয়-পরাজয় :**

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার মোট ১৪জন শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হন। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূয়ায় )( নিক্ষেপ করা হয়। ৪২৯ যাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহলসহ ১৪জন নেতার ১১ জন ছিল। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান (মৃ. মদীনায় ৩০ অথবা ৩৪ হি.), জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (মৃ. ৫৭ হি.) ও হাকীম বিন হেযাম (মৃ. ৫৪ হি.) মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন এবং তাদের ইসলাম আমৃত্যু সুন্দর ছিল।

উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম ও আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। আবু লাহাব বদর যুদ্ধের সপ্তাহকাল পরে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

**শুহাদায়ে বদর :**

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যে ১৪ জন শহীদ হয়েছিলেন, তন্মধ্যে মুহাজির ছয় জন হ'লেন, (১) মিহজা' )(, যিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মুক্তদাস ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর প্রথম শহীদ। (২) বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব থেকে উবায়দাহ ইবনুল হারিছ বিন মুত্ত্বালিব। শত্রু পক্ষের নেতা উৎবাহ বিন রাবী'আহ তাঁর পা কেটে দেন। পরে 'ছাফরা' গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (৩) বনু যোহরা থেকে উমায়ের বিন আবু

ওয়াকক্কাছ। যিনি সা'দ বিন আবু ওয়াকক্কাছের ভাই ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সের তরুণ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কাঁদতে থাকেন। ফলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে যান (আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬০৬১)। (৪) মুহাজিরগণের মিত্র যুশ-শিমালাইন বিন 'আব্দে আমর আল-খুযাঈ। (৫) বনু 'আদীর মিত্র 'আক্কেল বিন বুকায়ের। (৬) বনুল হারেছ বিন ফিহর থেকে ছাফওয়ান বিন বায়যা।

অতঃপর আনছারদের মধ্যেকার আট জন হ'লেন, (১) বনু নাজ্জার থেকে হারিছাহ বিন সুরাক্বাহ। (২-৩) বনু গানাম থেকে 'আফরার দুই পুত্র 'আওফ ও মু'আউভিয। (৪) বনুল হারেছ বিন খাযরাজ থেকে ইয়াযীদ বিন হারেছ। (৫) বনু সালামাহ থেকে উমায়ের বিন হুমাম। (৬) বনু হাবীব থেকে রাফে' বিন মু'আল্লা। (৭) বনু 'আমর বিন 'আওফ থেকে সা'দ বিন খায়ছামা এবং (৮) মুবাশশির বিন আব্দুল মুনযির)।

**নিহত কোরাস নেতা বৃন্দের কয়েকজন:**

বদর যুদ্ধে কুরায়েশ পক্ষের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হন (ইবনু হিশাম ১/৭১৪)। নিহতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হ'লেন, (১-৫) বনু 'আব্দে শামস গোত্রের উৎবাহ ও তার পুত্র অলীদ এবং ভাই শায়বাহ বিন রাবী'আহ, হানযালা বিন আবু সুফিয়ান এবং উকুবা বিন আবু মু'আইত্ব। যাকে পরে হত্যা করা হয়। (৬) বনু মাখযূম গোত্রের আবু জাহল 'আমর ইবনু হিশাম। (৭-৮) বনু জুমাহ গোত্রের উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহী ও তার পুত্র আলী। (৯) বনু আসাদ গোত্রের আবুল বাখতারী 'আছ বিন হিশাম ও (১০) নওফাল বিন খুওয়াইলিদ বিন আসাদ (কুরাইশের শয়তানদের অন্যতম)। (১১) বনু নওফাল গোত্রের তু'আইমা বিন 'আদী। জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম-এর চাচা। (১২) বনু 'আব্দিদ্দার গোত্রের নযর বিন হারেছ। যাকে পরে হত্যা করা হয়। (১৩-১৪) বনু সাহম গোত্রের নুবাইহ ও মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ দুই ভাই (ইবনু হিশাম ১/৭০৮-১৩)।

**প্রসিদ্ধ কুরাইশ বন্দীদের কয়েকজন:**

(১) বনু হাশেম গোত্র থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব। (২)চাচাতো ভাই 'আক্বীল বিন আবু তালিব (৩) নওফাল বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (৪) বনু 'আব্দে শাম্স গোত্রের আমর বিন আবু সুফিয়ান (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা 'আব্দে শামস গোত্রের আবুল 'আছ বিন রবী'। ইনি যয়নাবের স্বামী ছিলেন। তার বিনিময় মূল্য হিসাবে বিবাহকালে খাদীজা (রাঃ)-এর দেওয়া কণ্ঠহার দেখে রাসূল (ছাঃ) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে যয়নাবকে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনরূপ বিনিময় মূল্য ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয় । (৬) বনু জুমাহ গোত্রের আমর বিন উবাই বিন খালাফ । ইবনু হিশাম তার তালিকায় আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নাম দেননি। কারণ তিনি আগে থেকেই 'মুসলিম' ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের ভয়ে তাঁর ইসলাম গোপন রেখেছিলেন ।

**মক্কায় পরাজয়ের খবর ও তার প্রতিক্রিয়া:**

হায়সুমান বিন আব্দুল্লাহ আল-খুযাঈ সর্বপ্রথম মক্কায় পরাজয়ের খবর পৌঁছে দেয়। এ খবর তাদের উপরে এমন মন্দ প্রভাব ফেলল যে, তারা শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেল এবং সকলকে বিলাপ করতে নিষেধাজ্ঞা জারী করল। যাতে মুসলমানেরা তাদের দুঃখ দেখে আনন্দিত হবার সুযোগ না পায়। যুদ্ধ ফেরত ভাতিজা আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবকে দেখে আবু লাহাব সাগ্রহে যুদ্ধের খবর কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন একটা দলের মুকাবিলা করেছি, যাদেরকে আমরা আমাদের কাঁধগুলি পেতে দিয়েছি। আর তারা ইচ্ছামত হত্যা করেছে ও বন্দী করেছে। এতদসত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের তিরষ্কার করছিনা এ কারণে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মুকাবিলা এমন কিছু শুভ্রবসন লোকের সঙ্গে হয়েছিল, যারা আসমান ও যমীনের মাঝখানে সাদা-কালো মিশ্রিত )( ঘোড়ার উপরে সওয়ার ছিল। আল্লাহ্র কসম! না তারা কোন কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছিল, না কেউ তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারছিল' )( । একথা শুনে পাশেই দাঁড়ানো আবু রাফে', যিনি আব্বাস-এর গোলাম ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, তিনি বলে ওঠেন, 'আল্লাহ্র কসম! ওঁরা ফেরেশতা'। একথা শুনে ক্ষুব্ধ নেতা আবু লাহাব তার গালে ভীষণ জোরে এক চড় বসিয়ে দিল। তখন উভয়ে লড়াই

শুরু হয়ে গেল। আবু লাহাব আবু রাফে'-কে মাটিতে ফেলে দিয়ে মারতে লাগল। তখন আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল (রাঃ) এসে তাঁবুর একটা খুঁটি নিয়ে আবু লাহাবকে ভীষণ জোরে মার দিয়ে বললেন, ওর মনিব বাড়ী নেই বলে তুমি ওকে দুর্বল ভেবেছ?' এতে লজ্জিত হয়ে আবু লাহাব উঠে গেল। এর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই আল্লাহ্ হুকুমে সে আদাসাহ )( নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সারা দেহ পচে গলে মারা গেল। গুটি বসন্তের ন্যায় এই রোগকে সেযুগে মানুষ কু-লক্ষণ ও সংক্রামক ব্যাধি বলে জানত। ফলে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে যায় এবং সে নিঃসঙ্গভাবে মৃত্যুবরণ করে। এ অবস্থায় তিনদিন লাশ পড়ে থাকলেও কেউ তার কাছে যায়নি। অবশেষে একজন লোকের সহায়তায় তার দুই ছেলে তার লাশ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে গর্তে ফেলে তার উপর মাটি ও পাথর ছুঁড়ে পুঁতে দিল দুর্গন্ধের ভয়ে। এইভাবে এই দুরাচার দুনিয়া থেকে বিদায় হ'ল। ছাফা পাহাড়ের ভাষণের দিন রাসূল (ছাঃ)-কে 'সর্বদা তুমি ধ্বংস হও' বলার ১৫ বছর পরে তার এই পরিণতি হয়।

**মদিনায় বিজয়ের খবর :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারীকে মদীনার উচ্চ ভূমিতে এবং যায়েদ বিন হারেছাহকে নিম্নভূমিতে পাঠিয়ে দেন মদীনায় দ্রুত বিজয়ের খবর পৌঁছানোর জন্য। ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ও হযরত ওছমানের স্ত্রী রুক্বাইয়া (রাঃ)-কে দাফন করে মাটি সমান করা হচ্ছিল। যার অসুখের কারণে রাসূল (ছাঃ) ওছমান ও উসামা বিন যায়েদকে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য। ৪৩৫

অন্য দিকে ইহুদী ও মুনাফিকরা রাসূল (ছাঃ)-এর পরাজয় এমনকি তাঁর নিহত হবার খবর আগেই রটিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর নিশ্চিত খবর জানতে পেরে মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মদীনা মুখরিত করে তোলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে অভ্যর্থনার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন ।

**গণিমত বন্টন:**

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন যে, এরি মধ্যে গণীমতের মাল নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যা এক সময়ে চরমে ওঠে। যারা শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেছিল ও কাউকে হত্যা ও কাউকে বন্দী করেছিল, তারা তার সব মাল দাবী করল। আরেক দল যারা গণীমত জমা করেছিল, তারা সব মাল তাদের বলে দাবী করল। আরেক দল যারা রাসূল (ছাঃ)-কে পাহারা দিয়ে তাঁকে হেফাযত করেছিল, তারাও সব নিজেদের বলে দাবী করল। এ সময় সূরা আনফাল প্রথম আয়াত নাজিল হয়।

**যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে ফায়ছালা :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের একদিন পরে বন্দীদের কাফেলা মদীনায় পৌঁছে। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং ছাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান । কেননা ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য। অতঃপর তিনি ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন। কেননা এর ফলে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের হেদায়াত নছীব করতে পারেন এবং তারা আমাদের জন্য সাহায্যকারী হ'তে পারে। কিন্তু ওমর ফারুক (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করার পরামর্শ দেন। দয়ার নবী আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং অধিকাংশ বন্দীকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিলেন। জামাতা আবুল 'আছ সহ কয়েকজনকে রক্তমূল্য ছাড়াই মুক্তি দেন।

আবুল 'আছ ছিলেন খাদীজার সহোদর বোনের ছেলে এবং রাসূল-কন্যা যয়নবের স্বামী। ফিদইয়া দিতে অক্ষম কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করাপর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর আকুল আগ্রহের প্রমাণ

মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে ছিল নযীরবিহীন। ওছমান (রাঃ)সহ নয় জন ছাহাবীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও গণীমতের অংশ দেন তাদের যথার্থ ওযর ও অন্যান্য সহযোগিতার কারণে।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় রাসূল-কন্যা রুক্বাইয়া মৃত্যু শয্যায় থাকার কারণে ওছমান গণী (রাঃ) ও উসামা বিন যায়েদ-কে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৭০)। রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা আবুল 'আছ বিন রবী'-এর রক্তমূল্য বাবদ তাঁর কন্যা যয়নবের যে কণ্ঠহারটি পেশ করা হয়, তা ছিল হযরত খাদীজার দেওয়া। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'যদি তোমরা যয়নাবের জন্য তার বন্দীকে মুক্তি দিতে এবং তার কণ্ঠহারটিকে তার কাছে ফেরৎ দিতে'! তখন সবাই বলল, হ্যাঁ। অতঃপর কন্যা যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার শর্ত করা হয়। অতঃপর বদর যুদ্ধের কাছাকাছি এক মাস পর যায়েদ বিন হারেছাহ ও একজন আনছার ছাহাবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হয়। উক্ত কণ্ঠহার বিষয়ে 'অনন্য কণ্ঠহার' নামে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত আরবী নিবন্ধ বাংলাদেশের সরকারী ডিগ্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসাবে রয়েছে।

হিজরতকালে হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব যয়নাবকে তার হাওদায় বর্শা দিয়ে আঘাত করে। তাতে তিনি উটের পিঠ থেকে একটি পাথরের উপর পতিত হ'লে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। যাতে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় ও প্রচুর রক্তক্ষরণ হ'তে থাকে। এসময় আবু সুফিয়ান দলবল নিয়ে এসে উটচালক তাঁর দেবর কেনানাহ বিন রবী'-কে বললেন, মুহাম্মাদের আহত মেয়েটিকে নিয়ে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে যাওয়াটা আমাদের জন্য হীনকর। তাকে আটকিয়ে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি ওকে নিয়ে ফেরৎ যাও। অতঃপর রাতের বেলা গোপনে গিয়ে তার বাপের হাতে মেয়েকে পৌছে দাও। তার কথামতে কিনানাহ ফিরে যান এবং কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান শেষে একটু সুস্থ হ'লে রাতের বেলা তাকে নিয়ে যায়েদ বিন হারেছাত্র নিকট পৌঁছে দেন। এভাবে ইসলামের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে যয়নব মদীনায় পিতৃগৃহে এবং আবুল 'আছ মক্কায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে থাকেন। এ মর্মান্তিক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন, 'সে আমার সেরা মেয়ে। আমার জন্য সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে'।

পরবর্তীতে ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবুল 'আছ মুসলমান হয়ে মদানায় এলে যয়নবকে ছয় বছর পরে তার স্বামীর কাছে ন্যস্ত করা হয় এবং যয়নব ৮ হিজরীর প্রথম দিকে এবং আবুল 'আছ তাদের পূর্ব বিবাহ বহাল রাখা হয়। ১২ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন ।

উল্লেখ্য যে, হাব্বার মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন

বন্দীমুক্তির পরের দিনই সূরা আনফালের ৬৭ ও ৬৮ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শের প্রতি আল্লাহর সমর্থন প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) ক্রন্দন করতে থাকেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيم

'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান আখেরাতের কল্যাণ। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'। 'আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদেরকে ভয়ংকর শাস্তি পাকড়াও করত' (আনফাল ৮/৬৭-৬৮)।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত পূর্ব বিধানটি ছিল নিম্নরূপ:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا -

'অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না শত্রু অস্ত্র সমর্পণ করে.. (মুহাম্মাদ ৪৭/৪)।

উল্লেখ্য যে, নাখলা যুদ্ধের পরে ও বদর যুদ্ধের পূর্বে শা'বান মাসে যুদ্ধ ফরয করে সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়। যাতে যুদ্ধের বিধি-বিধান সমূহ বর্ণিত

হয়। এজন্য এ সূরাকে 'সূরা ক্বিতাল' )سُوْرَةُ الْقِتَال( বলা হয়। তবে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয় হিজরতের সময়কালে, কুরায়েশদের অব্যাহত সন্ত্রাস ও হামলা মুকাবিলার জন্য।

উক্ত সূরা মুহাম্মাদ ৪ আয়াতে অনুগ্রহ অথবা মুক্তিপণের কথা বলা হয়েছে। সেই বিধান মতেই বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সূরা আনফালে বর্ণিত ধমকির আয়াত দু'টি (৬৭-৬৮) সঙ্গে সঙ্গে নাযিল না হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে নাযিল হওয়ার মধ্যে আল্লাহর অশেষ করুণা নিহিত ছিল। যাতে বনু হাশেম সহ মুসলমানদের অনেক হিতাকাংখী বন্দী মুক্তি পান ও পরে তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যান। এই সময় বন্দী বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। যেমন হযরত সা'দ বিন নু'মান (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য মক্কায় গেলে আবু সুফিয়ান তাকে আটকে দেন। পরে বদর যুদ্ধে বন্দী তার পুত্র আমর বিন আবু সুফিয়ানকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা হয়।

## মদিনার সনদ :

মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ আউস ও খাযরাজ নেতাগণ আগেই ইসলাম কবুল করায় এবং আউস ও খাযরাজ দুই প্রধান গোত্রের আমন্ত্রণ থাকায় তাদের সাথে সন্ধিচুক্তির কোন প্রশ্নই ছিল না। খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নেতৃত্বের অভিলাষী থাকলেও গোত্রের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যে কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না। বদর যুদ্ধের পর সে এবং তার অনুসারীরা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে। তবে সেসময় মদীনার সংখ্যালঘু ইহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের নবতর জীবনধারার প্রতি এবং বিশেষভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকলেও অতি ধূর্ত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি। সমস্যা ছিল কেবল কুরায়েশদের নিয়ে। তারা পত্র প্রেরণ ও অন্যান্য অপতৎপরতার মাধ্যমে মুনাফিক ও ইহুদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাসূল (ছাঃ) ও তার সাথীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে। একাজে তারা যাতে সফল না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

সেকারণ তিনি পার্শ্ববর্তী নিকট ও দূরের এলাকাসমূহের বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। যেমন, (১) ২য় হিজরীর ছফর মাসে মদীনা হ'তে ২৯ মাইল দূরবর্তী ওয়াদ্দান )( এলাকায় এক অভিযানে গেলে রাসূল (ছাঃ) সেখানকার বনু যামরাহ )( গোত্রের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। (২) অতঃপর ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বুওয়াত্ব )( এলাকায় এক অভিযানে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথেও সন্ধিচুক্তি করেন। (৩) একই বছরের জুমাদাল আখেরাহ মাসে ইয়ামু' ও মদীনার মধ্যবর্তী যুল-'উশায়রা )ও( এলাকায় গিয়ে তিনি বনু মুদলিজ )( গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবে রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন, যেন যুদ্ধাশংকা দূর হয় এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এসময় মদীনায় ইহুদী চক্রান্ত চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। যার নেতৃত্বে ছিল তাদের ধনশালী নেতা ও ব্যঙ্গ কবি কা'ব বিন আশরাফ। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে কটূক্তি করাই ছিল তার বদস্বভাব।

এ বিষয়ে ছহীহ সনদে কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ইহুদী নেতা কা'ব বিন আশরাফ রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা বলত এবং কাফের কুরায়েশদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানী দিত। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আসেন, তখন এখানে মিশ্রিত বাসিন্দারা ছিল। তাদের মধ্যে মুসলমানেরা ছিল। মুশরিকরা ছিল, যারা মূর্তিপূজা করত। ইহুদীরা ছিল, যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের কষ্ট দিত। এমতাবস্থায় আল্লাহ স্বীয় নবীকে ছবর ও মার্জনার আদেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। 'অবশ্যই তোমরা পরীক্ষায় পতিত হবে তোমাদের ধন-সম্পদে ও তোমাদের নিজেদেরজীবনে। আর তোমরা অবশ্যই শুনবে তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। যদি তোমরা তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর, তবে সেটাই হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ' (আলে ইমরান ৩/১৮৬)। অতঃপর যখন কা'ব বিন আশরাফ রাসূল (ছাঃ)-কে কষ্টদানে বিরত থাকতে অস্বীকার করল, তখন রাসূল (ছাঃ) আউস নেতা সা'দ বিন মু'আযকে তার বিরুদ্ধে। একদল লোক পাঠাতে বললেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে। তখন তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে পাঠালেন। অতঃপর তিনি (রাবী) তার হত্যার কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় ইহুদী ও মুশরিকরা ভীত হয়ে পড়ে। ফলে পরদিন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাযির হয়ে বলল, আমাদের নেতাকে রাতের বেলায় তার বাড়ীতে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তার ব্যঙ্গ

কবিতার কথা বললেন। অতঃপর তিনি তাদের বললেন তাঁর ও তাদের মধ্যে একটা লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে। যাতে তারা যেসব গালি ও কষ্ট দেয়, তা থেকে বিরত হয়। অতঃপর নবী (ছাঃ) তাঁর ও তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তিনামা )( লিখে দিলেন'।

অত্র হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তি লিখনের এই বিষয়টি হিজরতের পরেই নয়, বরং ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে হয়েছিল। যা অধিকাংশ জীবনীকার ও ইতিহাসবিদগণের বক্তব্যের বিরোধী। যেমন মুবারকপুরী বলেন, 'মদীনায় হিজরতের পরপরই নবগঠিত ইসলামী সমাজের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য' রাসূল (ছাঃ) মদীনার সনদ রচনা করেন (আর-রাহীক্ব ১৯২ পৃঃ)। অথচ বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বর্ণনার চাইতে ছহীহ হাদীছের গুরুত্ব সর্বাধিক।

জীবনীকারগণ উপরোক্ত ছহীহ হাদীছের জওয়াবে বলেন, এটি '১ম চুক্তির নবায়ন )( হ'তে পারে। ৪৫৭ চুক্তিটি বিস্তারিতভাবে এসেছে ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় সনদবিহীনভাবে (ইবনু হিশাম ১/৫০১-০৪ পৃঃ)। শায়খ আলবানী বলেন, এভাবে ইবনু ইসহাক সনদ ছাড়াই এটি বর্ণনা করেছেন। অতএব বর্ণনাটি মু'যাল (যঈফ)। ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ যাদুল  মা'আদে কেবল এ টুকু লিখেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থানকারী ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেন এবং তিনি তাঁর ও তাদের মধ্যে একটি দলীল লিপিবদ্ধ করেন' (যাদুল মা'আদ ৩/৫৮ পৃঃ)। এতটুক ব্যতীত আগে-পিছে কোন বক্তব্য বা মন্তব্য নেই। ইবনু কাছীর (৭০১-৭৪ হি.) কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই ইবন ইসহাকের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন (আল-বিদায়াহ ৩/২২৪-২৬)। যেটি তাঁর স্বভাব বিরোধী। এতদ্ব্যতীত ইমাম আহমাদ (হা/২৪৪৩), ইবনু আবী খায়ছামাহ, আবু ওবায়েদ ক্বাসেম বিন সাল্লাম, বায়হাক্বী, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু হাযম প্রমুখ যারাই উক্ত চুক্তি সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনটাই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। সম্ভবতঃ একারণেই বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) তাঁর 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থে এবং ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) স্বীয় 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত' গ্রন্থে বিভিন্ন হিজরী সনে 'প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী'র তালিকায় এটি আনেননি। এ চুক্তিনামা সঠিক হ'লে তিনি তা ১ম হিজরী সনের

ঘটনাবলীর মধ্যে অবশ্যই আনতেন। অতএব ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হ'লেও বিশুদ্ধ নয় (মা শা-'আ ৯১-৯৮ পৃঃ)।

ছহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল এটুকুই পাওয়া যায় যে, ৩য় হিজরী সনে তিনি ইহুদীদের ও অন্যান্যদের মধ্যে একটা 'চুক্তিনামা' লিখে দিয়েছিলেন। সেটিই 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত। তবে সেখানে তখনকার সময়ে প্রয়োজনীয় সবকিছুই লেখা ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাতে কি লেখা ছিল, তা জানা যায় না।

## ওহুদ যুদ্ধ

কুরায়েশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনার তিন মাইল উত্তরে ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করে। এই বাহিনীর সাথে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবার নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি মহিলা দল ছিল, যারা নেচে-গেয়ে ও উত্তেজক কবিতা পাঠ করে তাদের সৈন্যদের উত্তেজিত করে। এই যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ সৈন্য ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে একটি ভুলের জন্য মুসলমানদের সাক্ষাৎ বিজয় অবশেষে বিপর্যয়ে পরিণত হয়। মুসলিম পক্ষে ৭০ জন শহীদ ও ৪০ জন আহত হন। তার মধ্যে মুহাজির ৪ জন, আনছার ৬৫ জন। যাদের মধ্যে আউস ২৪, খাযরাজ ৪১ এবং ইহূদী ১ জন। কুরায়েশ পক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়। তবে এই হিসাব চূড়ান্ত নয়। বরং কুরায়েশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী ('জয়-পরাজয় পর্যালোচনা' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও কুরায়েশরা বিজয়ী হয়নি। বরং তারা ভীত হয়ে ফিরে যায়। এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১২১-১৭৯ পর্যন্ত ৬০টি আয়াত নাযিল হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

**ওহোদ-এর পরিচয়** )( : মদীনার ওহোদ পাহাড়ের নামে এই যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে। পাহাড়টি অন্য পাহাড়ের সাথে যুক্ত না থেকে 'একক' হওয়ায় এর নাম ওহোদ )( হয়েছে। যার পর থেকে তায়েফের পাহাড় )( শুরু হয়েছে। এটি মসজিদে নববীর

'মাজীদী দরজা' )( থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এই পাহাড়ের কতগুলি চূড়া রয়েছে। এর সরাসরি দক্ষিণে ছোট্ট পাহাড়টির নাম 'আয়নায়েন' )(, যা পরবর্তীতে 'জাবালুর রুমাত'( ) বা তীরন্দাযদের পাহাড় বলে পরিচিত হয়। এ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বৃহৎ উপত্যকার নাম 'কুনাত' )(। যেখানে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের প্রায় ১১ মাস পরে' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৭৮)।

**যুদ্ধের কারণ** )( : মক্কা থেকে শামে কুরায়েশদের ব্যবসায়ের পথ নিরংকুশ ও নিরাপদ করাই ছিল তাদের এই যুদ্ধের মূল কারণ।

ছড়ে অতঃপর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, বদর যুদ্ধে কুরায়েশদের শোচনীয় পরাজয়, 'সাভীক্ব' যুদ্ধে ছাতুর বস্তাসহ অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ফেলে আবু সুফিয়ানের পালিয়ে আসার গ্লানিকর অভিজ্ঞতা এবং সবশেষে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে মদীনার সোজা পথ ছেড়ে নাজদের ঘোরা পথ ধরে সিরিয়া গমনকারী কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মুসলিম বাহিনী কর্তৃক লুট হওয়া এবং দলনেতা ছাফওয়ানের কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার লজ্জাকর ঘটনা। যার প্রেক্ষাপটে কুরায়েশ নেতারা মুসলমানদের সাথে কালবিলম্ব না করে একটা চড়ান্ত ফায়ছালাকারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সঙ্গত কারণেই এ ব্যাপারে বদর যুদ্ধে নিহত নেতা আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা, উৎবাহ্র ভাই আব্দুল্লাহ ও সাভীক যুদ্ধে পালিয়ে আসা আবু সুফিয়ান এবং সর্বশেষ বাণিজ্য কাফেলা ফেলে পালিয়ে আসা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

**যুদ্ধের পুঁজি** )( : বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বিবেচিত কুরাইশের যে বাণিজ্য কাফেলা আবু সুফিয়ান স্বীয় বুদ্ধিবলে মুসলিম বাহিনীর কবল থেকে বাঁচিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই বাণিজ্য সম্ভারের সবটুকুই মালিকদের সম্মতিক্রমে ওহোদ যুদ্ধের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়' ।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রথম দিকে বিজয়ী হয় এবং শত্রুবাহিনী ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তীরন্দাযগণের মারাত্মক ভুলের কারণে অরক্ষিত গিরিসংকট দিয়ে

শত্রুবাহিনী অতর্কিতে ময়দানে ঢুকে পড়ে। যাতে মুসলিম বাহিনী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে আহত হন। তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। এছাড়া মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। যার মধ্যে মুহাজির ৪ জন, ইহুদী ১ জন, বাকী ৬৫ জন আনছারের মধ্যে আউস গোত্রের ২৪ জন ও খাযরাজ গোত্রের ৪১ জন ছিলেন। কুরায়েশ বাহিনীর নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন ২২ জন, কেউ বলেছেন ৩৭ জন। কিন্তু এ হিসাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারাই বলছেন যে, একা হামযা (রাঃ) ৩০ জনের অধিক শত্রুসৈন্য খতম করেছেন'। তাছাড়া আলী (রাঃ) হত্যা করেছেন ৮ জনকে,কুযমান ৭ অথবা ৮ জনকে। এতদ্ব্যতীত যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম, মিক্দাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু দুজানা, আবুবকর, ওমর, আছেম বিন ছাবেত, হাতেব বিন আবু বালতা'আহ, আবু তালহা, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, মুহ্'আব বিন উমায়ের, উসায়েদ বিন হুযায়ের, হুবাব ইবনুল মুনযির, সা'দ বিন মু'আয, সা'দ বিন ওবাদাহ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ, সা'দ বিন রাবী', নযর বিন আনাস, আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, হানযালাহ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও তাঁর পিতা ইয়ামান, আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালিক ইবনু সিনান, জাবের-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম, হারিছ ইবনু ছিম্মাহ, উছায়রিম, মুখাইরীকু, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ, রাফে' বিন খাদীজ, সামুরাহ বিন জুনদুব, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ, ক্বাতাদাহ বিন নু'মান, আনাস বিন নাযার, ছাবিত বিন দাহদাহ ও তার সঙ্গীরা, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ, সাহল বিন হুনাইফ প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের হাতে কত শত্রুসৈন্য খতম হয়েছে, তার হিসাব কোথায়? তিন হাযারের দুর্ধর্ষ কুরায়েশ বাহিনী কোনরূপ চরম মূল্য না দিয়েই কি ময়দান ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল? অতএব মুসলিম বীরদের হাতে তাদের যে অগণিত সৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরায়েশ বাহিনী বিজয়ী হ'লে মুসলিম বাহিনীর ঘাঁটি দখল করল না কেন? তাদের মালামাল লুট করল না কেন? তারা মদীনার উপরে চড়াও হ'ল না কেন? সে যুগের প্রথানুযায়ী বিজয়ী দল হিসাবে তারা সেখানে ৩ দিন অবস্থান করল না কেন? কেন একজন মুসলিম সৈন্যও তাদের হাতে বন্দী হ'ল না? অথচ কাফের বাহিনীর দু'জন কবির অন্যতম আবু 'আযযাহ মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর মুক্তিপণ হিসাবে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড

দেওয়া হয়। অতএব এটাকে 'অমীমাংসিত যুদ্ধ' বলা চলে। তবে আখেরাতের হিসাবে মুসলমানেরাই বিজয়ী এবং সর্বদা লাভবান তারাই। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, -করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে তারাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে যেমন তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছ। (পার্থক্য এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে (জান্নাত) আশা কর, যা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (নিসা ৪/১০৪)।

আল্লাহ তীরন্দাজদের সাময়িক পদস্খলনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم- 'তোমাদের মধ্যে যারা (ওহোদের যুদ্ধে) দু'দলের মুখোমুখি হবার দিন ঘাঁটি থেকে ফিরে গিয়েছিল, তাদের নিজেদের কিছু কৃতকর্মের দরুন শয়তান তাদের প্রতারিত করেছিল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল' (আলে ইমরান ৩/১৫৫)।

সেই সাথে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল যে, উম্মতের সামষ্টিক স্বার্থ জড়িত কোন কাজে শরীক হ'লে কেউ যেন আমীরের অনুমতি ছাড়া চলে না যায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور- (٦٢)

'মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তার সঙ্গে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাথী হয়, তখন যেন তারা চলে না যায় তার কাছ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত। নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে তোমার নিকট অনুমতি চাইলে তাদেরকে তুমি অনুমতি দাও যাকে চাও। আর তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (নূর ২৪/৬২)।

# ওহুদ পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

**গাযওয়া হামরাউল আসাদ** )( : ৩য় হিজরীর ৮ই শাওয়াল রবিবার। আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় মদীনা আক্রমণ করতে পারে, এই আশংকায় রাসূল (ছাঃ) ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কার দিকে ১২ কি. মি. দূরে হামরাউল আসাদে পৌঁছেন। তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান শেষে মদীনায় ফিরে আসেন। (বিস্তারিত ৩৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

**সারিইয়া আবু সালামাহ** )(: ৪র্থ হিজরীর ১লা মুহাররম। তালহা ও সালামা বিন খুওয়াইলিদ নামক কুখ্যাত ডাকাত দু'ভাই বনু আসাদ গোত্রকে মদীনা আক্রমণের প্ররোচনা দিচ্ছে মর্মে খবর পৌছলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় দুধভাই আবু সালামাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুহাজির ও আনছারদের ১৫০ জনের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। বনু আসাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই তাদের 'ক্বাতান' (২) নামক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণের ফলে তারা হতচকিত হয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী তাদের ফেলে যাওয়া উট ও বকরীর পাল ও গণীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। এই যুদ্ধ থেকে ফিরে কিছু দিনের মধ্যে আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। আবু সালামা ইতিপূর্বে ওহোদের যুদ্ধে যখমী হয়েছিলেন'

. **সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন উনাইস** )( : ৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম সোমবার। মুসলমানদের উপরে হামলার জন্য নাখলা অথবা উরানাহ নামক স্থানে খালেদ বিন সুফিয়ান বিন নুবাইহ আল-হুযালী সৈন্য সংগ্রহ করছে মর্মে বলে সংবাদ পেয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আল-জুহানী আনছারীকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে হত্যা করে মদীনায় ফিরে আসেন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে তার নিহত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেন।

**সারিইয়া বি'রে মাউলা :**

র্থ হিজরীর ছফর মাস। নাজদের নেতা আবু বারা 'আমের বিন মালেকের আমন্ত্রণক্রমে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদবাসীদের

কুরআন পড়ানোর জন্য ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য মুনযির বিন 'আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি মবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন। যাদের সকলে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় কারা ও বিজ্ঞ আলেম। যারা দিনের বেলায় কাঠ কুড়াতেন এবং রাত্রি জেগে নফল ছালাত আদায় করতেন। তাঁরা মাউনা নামক কয়ার নিকটে অবতরণ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র নিয়ে হারাম বিন মিলহান গোত্রনেতা 'আমের বিন তুফায়েল-এর নিকটে গমন করেন। কিন্তু সে পত্রের প্রতি দৃকপাত না করে একজনকে ইঙ্গিত দেয় তাকে হত্যা করার জন্য। ফলে হত্যাকারী তাকে পিছন দিক থেকে বর্শা বিদ্ধ করে। এ সময় রক্ত দেখে হারাম বিন মিলহান বলে ওঠেন, 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'। অতঃপর 'আমের বিন তুফায়েলের আবেদনক্রমে বনু সুলাইমের তিনটি গোত্র উছাইয়া, রে'ল ও যাকওয়ান ) চতুর্দিক হ'তে তাদের উপরে আক্রমণ চালায় এবং সবাইকে হত্যা করে। একমাত্র 'আমর বিন উমাইয়া যামরী রক্ষা পান মুযার গোত্রের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে। এতদ্ব্যতীত বনু নাজ্জারের কা'ব বিন যায়েদ জীবিত ছিলেন। তাঁকে নিহতদের মধ্য থেকে যখমী অবস্থায় উঠিয়ে আনা হয়। পরে তিনি ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় একটি অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শহীদ হন। ৫৪৮

এসময় জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিয়ে বললেন, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। এ ঘটনার পর রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে ৪০ দিন অন্য বর্ণনায় এক মাস যাবত কুনুতে নাযেলাহ পাঠ করেন।

হারাম বিন মিলহানের মৃত্যুকালীন শেষ বাক্যটি হত্যাকারী জাব্বার বিন সালমা )(-এর অন্তরে এমনভাবে দাগ কাটে যে, পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন'

**সারিইয়া রাজী'** : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে 'আযাল ও ক্বাররাহ গোত্রের সাতজন লোককে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। এক্ষণে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য ও কুরআন পড়ানোর জন্য কয়েকজন উঁচু মর্তবার ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ'তাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে 'আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৬জন মুহাজির ও ৪জন আনছারসহ ১০ জনের একটি মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন। 'আছেম হযরত ওমরের শ্বশুর ছিলেন এবং 'আছেম বিন ওমরের নানা ছিলেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা মতে হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদের উপর হামলা করে। যুদ্ধে 'আছেম সহ ৮জন শহীদ হন এবং দু'জনকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তারা হ'লেন হযরত খোবায়েব বিন 'আদী ও যায়েদ বিন দাছেনাহ )। উঁচু মর্তবার ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ'তাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে 'আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৬জন মুহাজির ও ৪জন আনছারসহ ১০ জনের একটি মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন। 'আছেম হযরত ওমরের শ্বশুর ছিলেন এবং 'আছেম বিন ওমরের নানা ছিলেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা মতে হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদের উপর হামলা করে। যুদ্ধে 'আছেম সহ ৮জন শহীদ হন এবং দু'জনকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তারা হ'লেন হযরত খোবায়েব বিন 'আদী ও যায়েদ বিন দাছেনাহ )।

সেখানে ওকুবা বিন হারেছ বিন 'আমের খোবায়েবকে এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ যায়েদকে হত্যা করে বদর যুদ্ধে তাদের স্ব স্ব পিতৃহত্যার বদলা নেয়। শূলে চড়ার আগে খোবায়েব দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, আমি ভীত হয়েছি, এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর কাফেরদের বদ দো'আ করেন এবং মর্মন্তুদ কবিতা বলেন, যা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

খোরায়েবের সেই বিখ্যাত দো'আটি ছিল নিম্নরূপ- اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا

- تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে রাখ। তাদেরকে এক

এক করে হত্যা কর এবং এদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না'। অতঃপর তাঁর পঠিত সাত বা দশ লাইন কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ-

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্ সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমা মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'। ৫৫০

যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খু হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার اللهِيد بن الدَّثَنَة

সেখানে ওকুবা বিন হারেছ বিন 'আমের খোবায়েবকে এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ যায়েদকে হত্যা করে বদর যুদ্ধে তাদের স্ব স্ব পিতৃহত্যার বদলা নেয়। শূলে চড়ার আগে খোবায়েব দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, আমি ভীত হয়েছি, এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর কাফেরদের বদ দো'আ করেন এবং মর্মন্তুদ কবিতা বলেন, যা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

খোরায়েবের সেই বিখ্যাত দো'আটি ছিল নিম্নরূপ- اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ- تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে রাখ। তাদেরকে এক

এক করে হত্যা কর এবং এদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না'। অতঃপর তাঁর পঠিত সাত বা দশ লাইন কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ-

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্ সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমা মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।

যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খু হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার ,

কখনোই না। মহান আল্লাহর কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক'। একথা শুনে বিস্মিত আবু সুফিয়ান বললেন, যেরূপ ভালোবাসে সেরূপ কাউকে আমি দেখিনি'। হারাম এলাকা থেকে বের করে ৬ কি. মি. উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থানে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার গোলাম নিসাতাস ইবনুদ দাছেনাকে হত্যা করে। অতঃপর একইদিনে খোবায়েবকে সেখানে শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয় (আল-বিদায়াহ ৪/৬৫-৬৬)।

বীরে মা'উনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী 'আমর বিন উমাইয়া যামরী প্রহরীদের লুকিয়ে অতীব চতুরতার সাথে খোবায়েবের লাশ এনে সসম্মানে দাফন করেন (আল-বিদায়াহ ৪/৬৬)। অন্যদিকে দলনেতা 'আছেম-এর লাশ আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা লোক পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তার লাশের হেফাযতের জন্য এক ঝাঁক ভীমরুল প্রেরণ করেন। ফলে মুশরিকরা তার লাশের নিকটে যেতে পারেনি। কেননা 'আছেম যেন কোন মুশরিক তাকে স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে তাঁর জীবদ্দশায় কখনো স্পর্শ না করেন'। পরে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ

তাঁকে মুশরিকের স্পর্শ থেকে মৃত্যুর পরেও হেফাযত করেছেন, যেমন তাকে জীবিত অবস্থায় হেফাযত করেছিলেন' (ইবনু হিশাম ২/১৭১)।

খোবায়েবকে হত্যার জন্য খরীদ করেন হুজায়ের বিন আবু ইহাব তামীমী, যিনি বদর যুদ্ধে নিহত হারেছ বিন 'আমের-এর সহোদর ভাই ছিলেন। তার দাসী, যিনি পরে মুসলমান হন, তিনি বলেন যে, খোবায়েব আমার বাড়ীতে আটক ছিল। একদিন আমি তাকে বড় এক থোকা আঙ্গুর খেতে দেখি। অথচ তখন মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না। তিনি বলেন, হত্যার সময় উপস্থিত হ'লে তিনি আমাকে বলেন, আমার জন্য একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিন, যাতে হত্যার পূর্বে আমি ক্ষৌরকর্ম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। তখন আমি আমার বাচ্চাকে দিয়ে তাঁকে একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিলাম। পরক্ষণে আমি

বলে উঠলাম, হায়! আমি এটা কি করলাম? আল্লাহ্র কসম! লোকটি নিজের হত্যার

বদলে আমার বাচ্চাকে হত্যা করবে। অতঃপর যখন সে বাচ্চার হাত থেকে ক্ষুরটি নিল-

তখন বলল, তোমার জীবনের কসম! তোমার মা যেন আমার বিশ্বাসঘাতকতার ভয় না

করেন, যখন তিনি তোমাকে এই ক্ষুরসহ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। অতঃপর সে বাচ্চাকে ছেড়ে দিল'

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশরা খোবায়েবকে হারেছ বিন 'আমেরের বাড়ীতে কয়েকদিন বন্দী রাখে। এ সময় তাকে কোন খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হয়নি। একদিন হঠাৎ হারেছ-এর ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটি ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে তার কাছে চলে আসে। তিনি তাকে আদর করে কোলে বসান। এ দৃশ্য দেখে বাচ্চার মা চিৎকার করে ওঠেন। তখন খোবায়েব বলেন, মুসলমান কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মৃত্যুর 'হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে তুমি তাঁকে আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে, সে খবরটি পৌঁছে দাও'।

ওমর (রাঃ)-এর গবর্ণর সাঈদ বিন 'আমের (রাঃ) যিনি খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের নিহত হবার দৃশ্য স্মরণ হ'লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহ্র পথে কতবড় ধৈর্যশীল তিনি ছিলেন যে, একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। বন্দী অবস্থায় তাঁকে থোকা থোকা আঙ্গুর খেতে দেখা গেছে। অথচ ঐসময় মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না' (ইবনু হিশাম ২/১৭২)।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে পরপর দু'টি হৃদয় বিদারক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দারুণভাবে ব্যথিত হন। অতঃপর তিনি বনু লেহিয়ান, রে'ল ও যাকওয়ান এবং উছাইয়া গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে এক মাস যাবত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বদ দো'আ করে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন। ৫৫১

**. সারিইয়া 'আমর বিন উমাইয়া যামরী**

হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী 'আমর বিন উমাইয়া যামরী বি'রে মাউনা হ'তে মদীনায় ফেরার পথে কারকক্বারা নামক বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে বনু কেলাব গোত্রের দু'ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সাথীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত গোত্রের সঙ্গে যে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল, তা তিনি জানতেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বিনিময় স্বরূপ রক্তমূল্য প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনা পরবর্তীতে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আরও কিছু ওহুদ পরবর্তী যুদ্ধ হলো

বনু নাজির যুদ্ধ।
গযওয়া নাজদ।
গযওয়া ভদ্র আখের ।
গযওয়া দোমাতুল জান্দাল ।
খন্ডক যুদ্ধ।

বনু কুড়াইজা যুদ্ধ।
বনু মুস্তালিক যুদ্ধ।

ইত্যাদি ।

# হুদাইবিয়ার সন্ধি

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'গাযওয়া' বা যুদ্ধ )( বলা হয় এ কারণে যে, কুরায়েশরা রাসূল (ছাঃ)-কে এখানে ওমরার জন্য মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৩৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার স্ত্রী উম্মে সালামাহ সহ ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাথী নিয়ে ওমরাহর উদ্দেশ্যে মদীনা হ'তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত তাদের সাথে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু মক্কার অদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁরা কুরায়েশ নেতাদের বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে তাদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং পরের বছর ওমরা করেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ।-

'হোদায়বিয়া' )( একটি কুয়ার নাম। যা মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২২ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এটি বর্তমানে 'শুমাইসী' )( নামে পরিচিত। এখানে হোদায়বিয়ার বাগিচাসমূহ এবং 'রিযওয়ান মসজিদ' )( অবস্থিত।

খন্দকের যুদ্ধে ভূমিধস বিজয়ের পরেও কুরায়েশদের শত্রুতা থেকে রাসূল (ছাঃ) নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সেকারণ অধিক সংখ্যক ছাহাবী নিয়ে তিনি ওমরায় এসেছিলেন এবং সাথে অস্ত্রও ছিল। ফলে যুদ্ধ হবে মনে করে দুর্বলচেতা ও বেদুঈন মুসলমানরা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে সরে পড়ে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا - (الفتح(١٢-١١

'পিছনে পড়ে থাকা বেদুঈনরা সত্বর তোমাকে বলবে, আমাদের মাল-সম্পদ ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে একথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বল, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে চাইলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ খবর রাখেন'। 'বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবারের কাছে আর কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরগুলিকে সশোভিত করে রেখেছিল। আর তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে ধ্বংসমখী এক সম্প্রদায়' (ফাৎহ ৪৮/১১-১২)। এখানে বেদুঈন (الأعراب) বলতে মদীনার জুহাইনা ও মুযাইনা গোত্র দ্বয়কে বুঝানো হয়েছে (তাফসীর তাবারী)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক রাতে স্বপ্ন দেখানো হ'ল যে, তিনি স্বীয় ছাহাবীদের সাথে নিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন এবং ওমরাহ করছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ١ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। এমনভাবে যে, তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করবেন' (ফাৎহ ৪৮/২৭)। অর্থাৎ তোমাদেরকে মক্কায় প্রবেশ না করিয়ে হোদায়বিয়া থেকে ফেরৎ আনার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কল্যাণ নিহিত থাকবে, তা তোমরা জানো না। অতঃপর সেই প্রত্যাবর্তনের বিনিময়ে তোমাদেরকে তিনি দান করবেন একটি 'নিকটবর্তী বিজয়'। অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি। অতঃপর সেখান থেকে ফিরেই হবে খায়বর বিজয় ও বিপুল গণীমত লাভ।

এ স্বপ্ন দেখার পরে তিনি ওমরাহ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ছাহাবীদের প্রস্তুত হ'তে বলেন। ইতিপূর্বে খন্দক যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সমগ্র আরবে মুসলিম শক্তিকে

অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে গণ্য করা হ'তে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুটা স্বস্তির মধ্যে ছিলেন।

**ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা** )( : ৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার তিনি ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাথী নিয়ে মদীনা হ'তে রওয়ানা হন (বুখারী হা/৪১৫৩)। লটারিতে এবার তাঁর সফরসঙ্গী হন উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)। ওমরাহ্ সফরে নিয়মানুযায়ী কোষবদ্ধ তরবারি এবং মুসাফিরের হালকা অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তাঁদের নিকটে রইল না। অতঃপর মদীনা থেকে অনতিদূরে যুল-হুলায়ফা পৌঁছে তাঁরা ওমরাহর ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৭০টি উটের গলায় হার পরালেন এবং উটের পিঠের কুঁজের উপরে সামান্য কেটে রক্তপাত করে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করলেন। আবু ক্বাতাদাহ আনছারী (রাঃ)-সহ অনেক ছাহাবী মুহরিম ছিলেন না। মুসলমানদের মিত্র বনু খোযা'আ গোত্রের বিশর বিন সুফিয়ান আল-কা'বী ) গোয়েন্দা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) আগেই মক্কায় পাঠিয়েছিলেন কুরায়েশদের গতিবিধি জানার জন্য। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে ৮০ কি. মি. দূরে 'ওসফান' পৌঁছলে উক্ত গোয়েন্দা এসে রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দেন যে, কুরায়েশরা ওমরাহতে বাধা দেওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। এজন্য তারা তাদের মিত্র বেদুঈন গোত্র সমূহকে সংঘবদ্ধ করেছে। তারা আপনার সফরের কথা শুনেছে এবং যুদ্ধ সাজে সজ্জিত অবস্থায় যু-তুওয়া )(-তে পৌঁছে গেছে। তারা আল্লাহর নামে কসম করেছে যে, আপনি কখনোই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। অন্যদিকে খালেদ বিন অলীদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে ৬৪ কি. মি. দূরে কুরাউল গামীমে পৌঁছে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,

يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةً فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٍ وَاللهِ لا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّائِفَة - رواه احمد -

'হায় দুর্ভোগ কুরায়েশদের জন্য! যুদ্ধ তাদের খেয়ে ফেলেছে। যদি তারা আমার ও অন্যদের মধ্য থেকে সরে দাঁড়াত, তাহ'লে তাদের কি সমস্যা ছিল? যদি তারা আমার ক্ষতি সাধন করতে পারে, তবে সেটি তাদের আশানুরূপ হবে। আর যদি আল্লাহ আমাকে তাদের উপর বিজয়ী করেন, তাহ'লে তারা ইসলামে প্রবেশ করবে পুরোপুরি

লাভবান অবস্থায়। আর যদি ইসলাম কবুল না করে, তাহ'লে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ তাদের শক্তি থাকবে। সুতরাং কুরায়েশরা কী ধারণা করে? আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে সেই দ্বীনের উপর যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে বিজয়ী করেন অথবা এই ক্ষুদ্র দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'। ৬২৩ রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্যে তাঁর শান্তিবাদী নীতি ফুটে উঠে।

**পরামর্শ বৈঠক:**

উক্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন এবং বললেন أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى 'হে লোকেরা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও!' অতঃপর তিনি তাদের নিকট দু'টি বিষয়ে মতামত চাইলেন। এক- কুরাইশের সাহায্যকারী গোত্রগুলির উপরে হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করা। অথবা দুই- আমরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখব এবং পথে কেউ বাধা দিলে মুকাবিলা করব। আবুবকর (রাঃ) শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, امْضُوا عَلَى اسْمِ الله 'তোমরা আল্লাহর নামে যাত্রা কর' (বুখারী হা/৪১৭৮-৭৯)। অতঃপর মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু হ'ল।

আহমাদ হা/১৮৯৩০; আলবানী, ফিকুহুস সীরাহ ৩১৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

**খালেদের অপকৌশল** )( :

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই জানা গেল যে, মক্কার মহা সড়কে 'কোরাউল পামীম' ) নামক স্থানে খালেদ বিন অলীদ ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন

মসলিম কাফেলার উপরে হামলা করার জন্য। যেখান থেকে উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। দূর থেকে মুসলমানদের যোহরের ছালাত আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করে তারা উপলব্ধি করে যে, মুসলমানেরা ছালাত আদায় কালে দুনিয়া ভুলে যায় ও আখেরাতের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তারা ভাবল, এই সুযোগে মুসলিম কাফেলার

উপরে হামলা চালিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে। আল্লাহ পাক তাদের এ চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেবার জন্য তাঁর রাসূল-এর উপর এ সময় ছালাতুল খাওফের বিধান নাযিল করলেন (নিসা ৪/১০১-১০২)। ফলে আছরের ছালাতের সময় একদল যখন ছালাত আদায় করলেন, অপরদল তখন সতর্ক পাহারায় রইলেন (আবুদাউদ হা/১২৩৬, সনদ ছহীহ)। এতে খালেদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

:

মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধ এড়ানোর জন্য মহাসড়ক ছেড়ে

ডান দিকে পাহাড়ী পথ ধরে অগ্রসর হ'তে থাকেন এবং মক্কার নিম্নাঞ্চলে হোদায়বিয়ার

শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণার নিকটে গিয়ে অবতরণ করেন। ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী

'ক্বাছওয়া' বসে পড়ে। লোকেরা বলল, কাছওয়া নাখোশ হয়েছে )(।

উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন,

- 'কাছওয়া নাখোশ হয়নি, আর এটা তার চরিত্রে নেই। কিন্তু তাকে আটকে

দিয়েছেন সেই সত্তা যিনি (আবরাহার) হস্তীকে (কা'বায় হামলা করা থেকে) আটকিয়েছিলেন'। তৃষ্ণার্ত সাথীদের পানির সমস্যা সমাধানে উক্ত ঝর্ণা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পানির আবেদন করল। তখন তিনি নিজের শরাধার থেকে একটি তীর বের করে তাদের হাতে দিলেন এবং সেটাকে ঝর্ণায় নিক্ষেপ করার জন্য বললেন। 'অতঃপর আল্লাহ্র কসম! ঝর্ণায় অতক্ষণ পর্যন্ত পানি জোশ মারতে থাকল, যতক্ষণ না তারা পরিতৃপ্ত হ'লেন এবং সেখান থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলেন'। ৬২৪ জাবের ও বারা বিন আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। অতঃপর তা থেকে ওযু করলেন। অতঃপর

অবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলতে বললেন। অতঃপর সেখান থেকে ঝর্ণাধারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হ'তে থাকল' বস্তুতঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।

**মধ্যস্থতা বৈঠক )( :**

হোদায়বিয়ায় অবতরণের কিছু পরে মুসলমানদের মিত্র বনু খোযা'আহ্ নেতা বুদাইল বিন অরক্বা )( কিছু লোক সহ উপস্থিত হ'লেন। তিনি এসে খবর দিলেন

যে, কুরায়েশ নেতা কা'ব ও 'আমের বিন লুওয়াই সৈন্য-সামন্ত এমনকি নারী-শিশু নিয়ে হোদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানিপূর্ণ ঝর্ণার ধারে শিবির স্থাপন করেছে, আপনাদের বাধা দেওয়ার জন্য ও প্রয়োজনে যুদ্ধ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে করতে আসিনি। বরং আমরা এসেছি কেবল ওমরাহ করার জন্য'। তিনি বললেন, কুরায়েশরা ইতিপূর্বে যুদ্ধ করেছে এবং তারা পর্যুদস্ত হয়েছে। তারা চাইলে আমি তাদের জন্য একটা সময় বেঁধে দেব, সে সময়ে তারা সরে দাঁড়াবে (এবং আমরা ওমরাহ করে নেব)। এরপরেও তারা যদি না মানে এবং কেবল যুদ্ধই তাদের কাম্য হয়, তাহ'লে যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এই দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আমার আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় অথবা আল্লাহ স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে দেন'।

অতঃপর বুদাইল কুরায়েশ নেতাদের কাছে গেলেন। তরুণরা তার কোন কথা শুনতে চাইল না। জ্ঞানীরা শুনতে চাইলেন। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য যথাযথভাবে বিবৃত করলেন।

ফলে সেখানে উপস্থিত উরওয়া বিন মাসউদ ছাক্বাফী বলে উঠলেন, আমাকে একবার তার কাছে যেতে দাও'। অতঃপর নেতাদের অনুমতি নিয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর

দরবারে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সেসব কথাই বললেন, যা তিনি ইতিপূর্বে বুদাইলকে বলেছিলেন। জবাবে উরওয়া বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি নিজ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দাও, তবে ইতিপূর্বে কোন আরব এরূপ করেনি। আর যদি

বিপরীতটা হয়, (অর্থাৎ তুমি পরাজিত হও) তবে আল্লাহ্র কসম! তোমার পাশে এমন কিছু নিকৃষ্ট লোককে দেখছি, যারা তোমার থেকে পালিয়ে যাবে অথবা ছেড়ে যাবে'। তার এ মন্তব্য শুনে ঠাণ্ডা মেযাজের মানুষ আবুবকর (রাঃ) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে,আমরা রাসূলকে রেখে পালিয়ে যাব ও তাঁকে ছেড়ে যাব'?

এরপর উরওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বারবার রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়িতে হাত দিচ্ছিলেন। ওদিকে পাশে দাঁড়ানো মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) নিজ তরবারির বাঁটে হাত দিচ্ছিলেন ও উরওয়াকে ধমক দিয়ে. (ছাঃ)-এর দাড়ি থেকে দূরে রাখ'। এভাবে উরওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছাহাবীগণের ভালাবাসার নমুনা সমূহ প্রত্যক্ষ করলেন। উল্লেখ্য যে, মুগীরা ছিলেন উরওয়ার ভাতিজা।

আলোচনা শেষে উরওয়া কুরায়েশদের নিকটে ফিরে গিয়ে বললেন, 'হে আমার কওম! আল্লাহ্র কসম!আমি কায়ছার, কিসরা, নাজাশী প্রমুখ সম্রাটদের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছি। কিন্তু কোন সম্রাট-এর প্রতি তার সহচরদের এমন সম্মান করতে দেখিনি, যেমনটি দেখেছি মুহাম্মাদের প্রতি তার সাথীদের সম্মান করতে'। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সম্মান প্রদর্শনের এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার কতগুলি উদাহরণ পেশ করে বলেন, আল্লাহ্র কসম! তারা তাঁর থুথু হাতে ধরে মুখে ও গায়ে মেখে নেয়। তার ওযূর ব্যবহৃত পানি ধরার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তার নির্দেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। তাঁর সাথে কথা বলার সময় সকলের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যায়। অধিক সম্মান প্রদর্শনের কারণে তাঁর প্রতি কেউ পূর্ণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না'। তিনি বললেন, এই লোকটি (মুহাম্মাদ) তোমাদের নিকটে একটা ভাল প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তোমরা সেটা কবুল করে নাও' (বুখারী হা/২৭৩১)।

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, উরওয়ার উপস্থিতিতে ছাহাবীগণ ভক্তির এই বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করেছিলেন, তাকে বাস্তবে একথা বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, যারা তাদের নেতার ভালোবাসায় এতদূর করতে পারে ও এতবড় সম্মান ও ভক্তি দেখাতে পারে, তাদের সম্পর্কে উরওয়া কিভাবে ধারণা করতে পারেন যে, কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত

হলে তারা রাসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে ও তাঁকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করবে? বরং বিভিন্ন গোত্রীয় যুদ্ধে স্রেফ গোত্রীয় স্বার্থের চাইতে তারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রণী ও আপোষহীন। ইবনু হাজার বলেন, এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, বৈধ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য যেকোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা যায়'। বস্তুতঃ এই ধরনের বাড়াবাড়ি আচরণের ঘটনা অন্য সময়ে দেখা যায়নি।

উরওয়া বিন মাসউদ-এর রিপোর্ট পাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত কুরায়েশ মিত্র বনু কেনানা গোত্রের বেদুঈন নেতা হুলাইস বিন আলক্বামা )( বললেন, আমাকে একবার যেতে দিন! অতঃপর নেতাদের অনুমতি নিয়ে তিনি গেলেন। দূর থেকে তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) মন্তব্য করলেন এ ব্যক্তি এমন একটি গোত্রের, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে'। অতএব তোমরা পশুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দাও। কাছে এলে লোকটি কুরবানীর পশুসমূহ দেখে খুশীতে বলে উঠলো, আল্লাহ্ ঘর থেকে বিরত রাখা উচিত নয়'। কথা বলেই লোকটি ফিরে গেল এবং কুরায়েশদের নিকটে তার উত্তম মতামত পেশ করল' (বুখারী হা/২৭৩১)। কিন্তু নেতারা বললেন, 'তুমি বস! তুমি একজন বেদুঈন মাত্র। তোমার কোন জ্ঞান নেই' (
এরপর নেতারা মিকরায বিন হাফছ )(-কে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ( তাকে দূর থেকে দেখেই মন্তব্য করলেন, 'লোকটি মিকরায। সে একজন দুষ্টু লোক'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে সেসব কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদাইল ও তার সাথীদের বলেছিলেন।

মিকরায কথা বলছেন। এমতাবস্থায় সুহায়েল বিন আমর ) এসে উপস্থিত হন। তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) মন্তব্য করলেন,  নশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বিষয়টি সহজ করে দিবেন'। অতঃপর সুহায়েল ও রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়। অবশেষে তাঁরা একটি আপোষ প্রস্তাবে সম্মত হন। যা 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত।

## হোদায়বিয়ার সন্ধি ও তার দফাসমূহ

১। মুহাম্মাদ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর ওমরাহ করবেন এবং মক্কায় তিনদিন অবস্থান করবেন। সঙ্গে সফরের

প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারি কোষবদ্ধ থাকবে। কুরায়েশরা তাদের প্রতি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না'। এই শর্তের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) আপত্তি জানালে সুহায়েল বলেন, যাতে আরবরা একথা বলার সুযোগ না পায় যে, মুসলমানেরা আমাদের উপরে যবরদস্তি প্রবেশ করেছে। বরং ওটা আগামী বছর'। অতঃপর তিনি মেনে নেন' (

২। কুরায়েশদের কোন লোক পালিয়ে মুহাম্মাদের দলে যোগ দিলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কুরায়েশদের নিকটে গেলে তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে না'। ৬২৮

৩। দু'পক্ষের মধ্যে আগামী ১০ বছর যাবৎ যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই সময় লোকেরা নিরাপদ থাকবে। কেউ কারু উপরে হস্তক্ষেপ করবে না'। ৬২৯

৪। যারা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তার দলে এবং যারা কুরায়েশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তাদের দলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাদের কারু উপরে অত্যাচার করা হ'লে সেটা সংশ্লিষ্ট দলের উপরে অত্যাচার বলে ধরে নেয়া হবে'

উপরোক্ত দফাগুলিতে একমত হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হযরত আলীকে ডাকলেন। অতঃপর তাকে লেখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, লিখ- 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। সুহায়েল বলল, 'রহমান' কি আমরা জানি না। বরং লিখুন- 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলীকে তাই-ই লিখতে বললেন। অতঃপর লিখতে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ সন্ধি করেছেন'। সোহায়েল বাধা দিয়ে বললেন, যদি আমরা জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহ'লে আমরা আপনাকে আল্লাহ্র ঘর হ'তে বিরত রাখতাম না এবং অবশ্যই আমরা আপনার হাতে বায়'আত করতাম'। অতএব লিখুন 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ'। জবাবে) আব্দুল্লাহ্ পুত্র মুহাম্মাদ এবং আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল' (বুখারী হা/৩১৮৪)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে থাক' (বুখারী হা/২৭৩১)। অতঃপর তিনি আলীকে বললেন 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখতে। কিন্তু আলী বললেন, 'কসম আল্লাহ্! কখনোই আমি

তা মুছবো না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে আমাকে স্থানটি দেখিয়ে দাও'। আলী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তখন তিনি নিজ হাতে ওটা মুছে দিলেন' (বুখারী হা/৩১৮৪)। অতঃপর তিনি বললেন, 'লেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ'। এভাবে চুক্তিনামা লিখন সম্পন্ন হ'ল।

## বাদশাহাদের নিকট পত্র প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুরা জীবনটাই ছিল দাওয়াত ও জিহাদের জীবন। দাওয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের প্রয়োজন হয়। মাক্কী জীবন ছিল এককভাবে দাওয়াতী জীবন। মাদানী জীবনে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি পেলেও তার মধ্যে তিনি সবসময় দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রে দাওয়াতী কাফেলা পাঠিয়েছেন। কখনো সফল হয়েছেন, কখনো বিফল হয়েছেন। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে আযাল ও ক্বারাহ গোত্রে 'আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১০ জনের এবং একই সময়ে নাজদের বনু সুলায়েম গোত্রে মুনযির বিন 'আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জনের যে তাবলীগী কাফেলা পাঠান, তারা সবাই আমন্ত্রণকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হয়ে যান। শেষোক্তটি বি'রে মাউনার ঘটনা হিসাবে পরিচিত (দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ২৪ ও ২৫)। আবার ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে সিরিয়ার দূমাতুল জান্দালের বনু কালব খ্রিষ্টান গোত্রের নিকটে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যে তাবলীগী কাফেলা পাঠানো হয়, তা সফল হয় এবং খ্রিষ্টান গোত্রনেতাসহ সবাই মুসলমান হয়ে যান (দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ৪৪)। এছাড়া নবী ও ছাহাবীগণ সকলে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। কেননা দাওয়াতই হ'ল ইসলামের রূহ। মাদানী জীবনে মুশরিক-মুনাফিক ও ইহুদীদের অবিরতভাবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলামের সুস্থ দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের জীবনে অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসে।

ফলে এ সময়টাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত প্রসারের জন্য একটি মহতী সুযোগ হিসাবে কাজে লাগান। এই সময় তৎকালীন আরব ও পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশা ও গোত্রনেতাদের নিকটে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রসারে তিনি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। পত্র বাহকের হাতে পত্রসমূহ প্রেরিত হয় এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী পত্রের শেষে সীলমোহর ব্যবহার করা হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর আংটিতে মুদ্রিত সীলমোহরটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং যাতে 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' )( )খাদিত ছিল। এতে তিনটি লাইন ছিল। মুহাম্মাদ এক লাইন, রাসূল এক লাইন এবং আল্লাহ এক লাইন'।

ওয়াক্বেদী, তাবারী প্রমুখ জীবনীকারগণের হিসাব মতে হোদায়বিয়া থেকে ফিরেই ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরবের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্রসমূহ প্রেরণ করেন। ইবনু সা'দ ও ইবনুল কাইয়িমের মতে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসের একই তারিখে ছয় জন পত্র বাহককে পত্রসহ প্রেরণ করা হয় ৬৪৮ উভয় তারিখের মধ্যে সমন্বয় করে ইবনু হাজার বলেন, কোন কোন পত্র যিলহাজ্জের শেষ দিকে পাঠানো হয়েছে, যা ৭ম হিজরীর মুহাররমে প্রাপকের নিকট পৌছেছে। যেমন হেরাক্লিয়াসের নিকটে প্রেরিত চিঠি (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৫)। এতদ্ব্যতীত যাকে যেখানে পাঠানো হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকে সেখানকার ভাষায় কথা বলতে পারতেন' (ইবনু সা'দ ১/১৯৮)।

উল্লেখ্য যে, হেরাকূলের নিকট লিখিত একটি মাত্র চিঠি ব্যতীত অন্য কোন পত্র সনদে ও মতনে হুবহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে পত্রসমূহ যে পাঠানো হয়েছিল, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِي وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পত্র লেখেন কিসরা, কায়ছার, নাজাশী এবং অন্যান্য সকল সম্রাটের নিকটে। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ দিকে আহ্বান করেন। তবে ঐ নাজাশী নন, যার মৃত্যুর পরে রাসূল (ছাঃ) তার গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন (কারণ তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন)' (মুসলিম হা/১৭৭৪)। অন্য বর্ণনায় দূমাতুল জান্দাল-এর খ্রিষ্টান শাসক উকায়দির-এর নিকটে পত্র লেখার বিষয়টি প্রমাণিত হয়' (আহমাদ হা/১২৩৭৮, হাদীছ ছহীহ)।

তবে হুবহু প্রমাণিত না হ'লেও হেরাকূলের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনায় অন্যান্য পত্রগুলি লিখিত হওয়ায় তা ঐতিহাসিকভাবে মূল্যায়নযোগ্য। যদিও তা আক্বীদা ও শরী'আত বিষয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৫৯)।

হেরাকূলের চিঠির শেষে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ আয়াতটি উল্লেখিত থাকায় বিদ্বানগণ সন্দেহে পতিত হয়েছেন। কেননা তাঁদের ধারণায় উক্ত আয়াত ৯ম হিজরীতে নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমনের সময় নাযিল হয়। ইবনু ইসহাক এটি বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ৬৪৯ বরং তাফসীরে তাবারীর বর্ণনা (হা/৭১৯১), যার সনদ ক্বাতাদাহ (৬১-১১৮ হিঃ) পর্যন্ত 'হাসান' হিসাবে প্রমাণিত। সেখানে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াত মদীনার ইহূদীদের বহিষ্কারের পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর ইহুদীদের বহিষ্কার চূড়ান্ত হয় ৫ম হিজরীর শেষে খন্দক যুদ্ধের পর। আর হেরাকূলের নিকট পত্র প্রেরিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষে হোদায়বিয়া সন্ধির পর । অতএব পত্রে উক্ত আয়াত লেখায় কোন সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক চিঠি 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে যেমন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি বাদশাহদেরকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদবী উল্লেখ করার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলামের প্রতি ও পরকালীন পুরস্কার লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

এক্ষণে যে সকল সম্রাট ও শাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল, সেই ৬ জন বিখ্যাত পত্রবাহক ও শাসকগণ হ'লেন, দেহিইয়া বিন খলীফা কালবীকে রোম সম্রাট কায়ছারের নিকটে, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে পারস্য সম্রাট কিসরা-র নিকটে, হাতেব বিন আবু বালতা'আহ লাখমীকে মিসর রাজ মুক্বাউক্বিস-এর নিকটে, সালীত্ব বিন 'আমর আল-'আমেরীকে ইয়ামামার শাসক হাওযাহ বিন 'আলী হানাফীর নিকটে, শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদীকে বালক্বা (দামেশকু)-এর শাসক হারেছ বিন আবু শিম্ম আল-গাসসানীর নিকটে এবং বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়া-র নিকটে

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) আরও কয়েকজন পত্র বাহককে বিভিন্ন শাসকের নিকট প্রেরণ করেন' ।

## খায়বার যুদ্ধ

কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির পর সকল ষড়যন্ত্রের মূল ঘাঁটি খায়বরের ইহুদীদের প্রতি এই অভিযান পরিচালিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ১৪০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি কোন মুনাফিককে এ যুদ্ধে নেননি। ৬৭ এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১৬ জন শহীদ এবং ইহুদী পক্ষে ৯৩ জন নিহত হয়। ইহুদীদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাদের আবেদন মতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ দেবার শর্তে তাদেরকে সেখানে বসবাস করার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয়

যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হয়। যাতে মুসলমানদের অভাব দূর হয়ে যায়। এই সময়ে ফাদাকের ইহুদীদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাইয়েছাহ বিন মাসউদকে )( প্রেরণ করেন। খায়বর বিজয়ের পর তারা নিজেরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং খায়বরবাসীদের ন্যায় অর্ধেক ফসলে সন্ধিচুক্তি করে। বিনাযুদ্ধে ও স্রেফ রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতে বিজিত হওয়ায় ফাদাক ভূমি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

যিলহাজ্জের মাঝামাঝিতে হোদায়বিয়া থেকে ফিরে মুহাররম মাসের শেষভাগে কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি সেবা' বিন উরফুত্বাহ গেফারীকে মদীনার প্রশাসক নিয়োগ করে যান।

মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তিনটি শক্তি- কুরায়েশ, বনু গাত্বফান ও ইহূদী- এগুলির মধ্যে প্রধান শক্তি কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বনু গাত্বফান ও বেদুঈন গোত্রগুলি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বাকী রইল ইহুদীরা। যারা মদীনা থেকে বিরুদ্ধে

সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র করে। বরং বলা চলে যে, খায়বর ছিল তখন বিতাড়িত হয়ে খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সেখান থেকেই মুসলমানদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। তাই এদেরকে দমন করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে যাতে কোন মুনাফিক যেতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ পূর্বেই আয়াত নাযিল করেন (ফাৎহ ৪৮/১৫)। তাছাড়া এ যুদ্ধে যে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হবে এবং প্রচুর গণীমত লাভ করবে, সে বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী নাযিল হয়েছিল (ফাৎহ ৪৮/২০)। ফলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র ঐ সকল সাথীকে সঙ্গে নিলেন, যারা হোদায়বিয়ার সফরে 'বায়'আতুর রিযওয়ানে' শরীর ছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০। এঁদের সাথে কিছু সংখ্যক মহিলা ছাহাবী ছিলেন। ৬৬৯ যারা আহতদের সেবা-যত্নে নিযুক্ত হন। আল্লাহপাকের এই আগাম হুঁশিয়ারীর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদের সঙ্গে ইহুদীদের সখ্যতা ছিল বহু পুরাতন। তাই তারা যুদ্ধে গেলে তারা বরং ইহুদীদের স্বার্থেই কাজ করবে, যা মুসলিম বাহিনীর চরম ক্ষতির কারণ হবে।

**মুনাফিকদের অপতৎপরতা )( :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খায়বর অভিযানের গোপন খবর মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আগেভাগেই ইহুদীদের জানিয়ে দিয়ে তাদের কাছে পত্র পাঠায়। তাতে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, 'তোমরা অবশ্যই জিতবে। কেননা মুহাম্মাদের লোকসংখ্যা অতীব নগণ্য এবং তারা প্রায় রিক্তহস্ত'। খয়বরের ইহুদীরা এই খবর পেয়ে তাদের মিত্র বনু গাত্বফানের নিকটে সাহায্য চেয়ে লোক পাঠায়। তাদেরকে বলা হয় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে খায়বরের মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদেরকে দেওয়া হবে'। উক্ত লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে বনু গাত্বফানের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিছু দূর গিয়েই তারা পিছন দিকে শোরগোল শুনে ভাবল, হয়তবা মুসলিম বাহিনী তাদের সন্তানাদি ও পশুপালের উপরে হামলা চালিয়েছে। ফলে তারা খায়বরের চিন্তা বাদ দিয়ে স্ব স্ব গৃহ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহ্ অদৃশ্য সাহায্য। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, মুসলমানদের ব্যাপারে তারা দারুণ ভীত ছিল। কেননা ইতিপূর্বে তারা খন্দকের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। এরপর সম্প্রতি কুরায়েশরা

মুসলমানদের সঙ্গে হোদায়বিয়ায় সন্ধিচুক্তি করেছে। তাতে মুসলিম ভীতি সর্বত্র আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

**খায়বরে উপস্থিতি :**

রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি ছিল কোথাও যুদ্ধের জন্য গেলে আগের দিন রাতে গিয়ে সেখানে অবস্থান নিতেন। অতঃপর সকালে হামলা করতেন। খায়বরের ক্ষেত্রেও তাই করলেন। তবে শিবিরের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে অভিজ্ঞ যুদ্ধবিশারদ আনছার ছাহাবী হুবাব ইবনুল মুনযির ( حبَابُ بنُ الْمُنذِر ) -এর পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিয়ে খায়বরের এত নিকটে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন, যেখান থেকে শহর পরিষ্কার দেখা যায়। সেখানে পৌঁছে তিনি সবাইকে বললেন, তোমরা থাম। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট নিম্নোক্তভাবে আকুল প্রার্থনা করলেন।-

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، وَرَبُّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا -

'হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ ও যেসবের উপরে এর ছায়া রয়েছে তার প্রভু। সপ্ত যমীন ও যা কিছু সে বহন করছে তার প্রভু। ঝঞ্ঝা-বায়ু এবং যা কিছু তা উড়িয়ে নেয়, তার প্রভু। শয়তান সমূহ ও যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের প্রভু। আমরা তোমার নিকটে এই জনপদের কল্যাণ, এর বাসিন্দাদের কল্যাণ ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমরা তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই জনপদের অনিষ্টতা হ'তে, এর বাসিন্দাদের অনিষ্টতা হ'তে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর অনিষ্টতা হ'তে'। অতঃপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আগে বাড়ো, আল্লাহ্র নামে'। অতঃপর খায়বরের সীমানায় প্রবেশ করে শিবির সন্নিবেশ করলেন।

**সন্ধির আলোচনা,:**

' কাতীবাহ' অঞ্চলের বিখ্যাত 'কামূছ' ) দুর্গের অধিপতি মদীনা হ'তে ইতিপর্বে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের নেতা আবুল হুক্বাইকু-এর দুই ছেলে সন্ধির

বিষয়ে আলোচনার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, দুর্গের মধ্যে যারা আছে, তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হবে। তাদের সোনা-রূপাসহ অন্যান্য সকল সম্পদ মুসলিম বাহিনীর অধিকারভুক্ত হবে। ইহুদীরা সপরিবারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাবে। সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় এসেছে যে, নিজ নিজ বাহনের উপরে যতটক মালামাল নেওয়া সম্ভব ততটুক নেওয়ার অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হয়। কেউ কিছু লুকালে সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব বা কোন চুক্তি থাকবে না। কিন্তু আবুল হুকাইকের ছেলেরা সন্ধিচক্তি ভঙ্গ করে অনেক মাল লুকিয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হ'ল 'হুয়াই বিন আখতাব-এর মশকটি কোথায়? ইতিপূর্বে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সময় হুয়াই বিন আখত্বাব চামড়ার মশক ভরে যে সোনা-দানা ও অলংকারাদি নিয়ে এসেছিল, সেই মশকটার কথা এখানে বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কেনানা বিন আবুল হুক্কাইকুের নিকটে বনু নাযীরের যে মূল্যবান সম্পদরাজি গচ্ছিত ছিল, সেগুলি সে জনশূন্য একটি স্থানে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলল যে, যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজে খরচ হয়ে গেছে। অতঃপর সেগুলি পাওয়া গেল। তখন সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে ইবনু আবিল হুক্কাইকুকে হত্যা করা হ'ল এবং তার পরিবার ও অন্যান্যদের বন্দী করা হ'ল। অতঃপর তাদের সবাইকে খায়বর থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে তারা অর্ধেক ফসল দানের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করে...

## খাইবার পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

খাইবার পরিবর্তিত যুদ্ধ সমূহ গুলো হল:

গাজওয়া দিল ক্বোরা
সারিইয়া আবান বিন সাইদ
গাজওয়া যাতুর রিক্কা
সারিইয়া  গালিব বিন আব্দুল্লাহ লাইছি
সারিইয়া যায়েদ বিন হারেসা
সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্তাব

সারিইয়া আবু বকর সিদ্দিক
সারিইয়া বাঁশির বিন শাদ
সারিইয়া গালে বিন আব্দুল্লাহ লাইছি
সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা
সারিইয়া বাঁশির বিন সাদ
সারিইয়া আবু হাদরাদ আস্লামি

## ক্বযা ওমরাহ

ইবনু ইসহাক বলেন, খায়বর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রবীউল আউয়াল থেকে শাওয়াল পর্যন্ত (৬ মাস) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কয়েকটি ছোট ছোট সেনাদল বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। অতঃপর গত বছরে কৃত হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তানুযায়ী তিনি এ বছর যুলক্বা'দাহ মাসে ওমরাহ করার জন্য প্রস্তুতি নেন (ইবনু হিশাম ২/৩৭০)। গত বছরে যারা হোদায়বিয়ায় হাযির ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তারা ছাড়াও অন্যান্যগণ মিলে মোট দু'হাযার ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে বের হন। মহিলা ও শিশুরা ছিল এই সংখ্যার বাইরে। মূসা বিন উকবাহ ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকদের চুক্তিভঙ্গের আশংকায় যুদ্ধে পারদর্শী লোকদের এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ সঙ্গে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে হারামের বাহিরে রেখে দেওয়া হয়। এ কথা জানতে পেরে কুরায়েশরা ভয় পেয়ে যায়। তখন তাদের পক্ষ থেকে গত বছরে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে অন্যতম আলোচক মিকরায বিন হাফছ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, তিনি শর্তের উপরেই দৃঢ় আছেন এবং কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত তারা মক্কায় প্রবেশ করেননি।

এই ওমরাহ চারটি নামে পরিচিত। যথা- ওমরাতুল ক্বাযা ); হুদায়বিয়ার ওমরাহ্ ক্বাযা হিসাবে), ওমরাতুল ক্বাযিইয়াহ ) : হোদায়বিয়ার ফায়ছালার প্রেক্ষিতে), ওমরাতুল ক্বিছাছ ); হোদায়বিয়ার ওমরাহর বদলা হিসাবে), ওমরাতুছ ছুল্লহ ); হোদায়বিয়া সন্ধির ওমরাহ)।

ইবনু হিশাম বলেন, 'উওয়াইফ বিন আযবাত্ব আদ-দীলী ) মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সঙ্গে নেন কুরবানীর জন্য ৬০টি উট। অতঃপর যুল-হুলায়ফা পৌঁছে ওমরাহর জন্য এহরাম বাঁধলেন এবং সকলে উঁচু স্বরে 'লাব্বায়েক' ধ্বনির মাধ্যমে তালবিয়াহ পাঠ করলেন। অতঃপর দীর্ঘ সফর শেষে মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরে ইয়া'জাজ () নামক স্থানে পৌছে বর্ম, ঢাল, বর্শা, তীর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সমূহ আওস বিন খাওলা আনছারীর )( )নতৃত্বে দু'শো লোককে এগুলির তত্ত্বাবধানে সেখানে রেখে দেওয়া হ'ল। বাকীরা মসাফিরের অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারিসহ মক্কায় গমন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উষ্ট্রী ক্বাছওয়া )(-এর পিঠে সওয়ার ছিলেন। মুসলমানগণ স্ব স্ব তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মাঝে রেখে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে দিতে 'হাজুন' মুখী টিলার পথ ধরে মক্কায় প্রবেশ করেন।

মুশরিকরা সব বেরিয়ে মক্কার উত্তর পার্শ্বে 'কু'আইকু ি'আন' )( পাহাড়ের উপর জমা হয়ে মুসলমানদের আগমন দেখতে থাকে এবং বলাবলি করতে থাকে যে, ইয়াছরিবের জ্বর এদের দুর্বল করে দিয়েছে'। একথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে নির্দেশ দিলেন যেন ত্বাওয়াফের সময় প্রথম তিন তাওয়াফ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে, যাকে 'রমল' )( বলা হয়। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক ভাবে চলবে। এ নির্দেশ তিনি এজন্য দেন, যাতে মুশরিকরা মুসলমানদের শক্তি-ক্ষমতা দেখতে পায়'। একই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের ইযত্বেবার )( নির্দেশ দেন (আহমাদ হা/৩১৭)। যার অর্থ হ'ল ডান কাঁধ খোলা রেখে বগলের নীচ দিয়ে চাদর বাম কাঁধের উপরে রাখা। যাতে ব্যক্তিকে সদা প্রস্তুত দেখা যায়। মুশরিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখতে থাকে। এবি মধ্যে তিনি 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে দিতে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় মাথা বাঁকা লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর তাওয়াফ করেন ও মুসলমানেরাও তাওয়াফ করে (আর-রাহীকু ৩৮৫ পৃঃ)।

আনাস (রাঃ) বলেন, তাওয়াফের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধছন্দে কবিতা বলে রাসূল (ছাঃ)-এর আগে আগে চলতে থাকেন। এতে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ 1 الشَّعْر ؟ 'হে

ইবনে রাওয়াহা! রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে ও আল্লাহর হারামের মধ্যে তুমি কবিতা পাঠ করছ'? তখন রাসূল (ছাঃ) ওমরকে বললেন,

ওকে ছাড় ওমর! এটা ওদের প্রতি তীর নিক্ষেপের চাইতেও দ্রুত কার্যকর'। হে কাফির সন্তানেরা! তোমরা আল্লাহর পথ থেকে সরে যাও। আজ আমরা তোমাদের মারব আল্লাহর কুরআনের উপরে'। (২) 'এমন মার, যা খুলিকে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে ভুলিয়ে দেবে' (

মুসলমানদের এই দ্রুতগতির তাওয়াফ ও সাহসী কার্যক্রম দেখে মুশরিকদের ধারণা পাল্টে গেল এবং তারা বলতে লাগল যে, তোমাদের ধারণা ছিল ভুল। هَؤُلاء أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا 'ওরা তো দেখছি অমুক অমুকের চাইতে বেশী শক্তিশালী' (মুসলিম হা/১২৬৬)। ত্বাওয়াফ শেষে তাঁরা সাঈ করেন এবং এ সময় মারওয়ার নিকটে তাদের কুরবানীর পশুগুলি দাঁড়ানো ছিল। সাঈ শেষে রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়ে বললেন, ' هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَر 'এটাই হ'ল কুরবানীর স্থান এবং মক্কার সকল অলি-গলি হ'ল কুরবানীর স্থল' (আবুদাউদ হা/২৩২৪)। অতঃপর তিনি সেখানে উটগুলি নহর করেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন। মুসলমানেরাও তাই করেন।

এভাবে হালাল হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদল ছাহাবীকে মক্কা থেকে আট মাইল দূরে ইয়া'জাজ পাঠিয়ে দেন। তারা সেখানে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র পাহারায় থাকেন এবং অন্যদের ওমরাহর জন্য পাঠিয়ে দেন (যাদুল মা'আদ ৩/৩২৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন সকালে মুশরিক নেতারা এসে আলী (রাঃ)-কে বলেন, সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী তিনদিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার তোমাদের নেতাকে যেতে বল। (৭১৮ তখন রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে তান'ঈম-এর নিকটবর্তী 'সারিফ' )( নামক স্থানে অবতরণ করেন। অতঃপর সেখানে চাচা আব্বাস-এর ব্যবস্থাপনায় মায়মূনাহ বিনতুল হারেছ-এর সাথে বিবাহ হয় ও সেখানে বাসর যাপন করেন' (বুখারী হা/৪২৫৮)।

মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাঃ)-এর শিশুকন্যা আমাতুল্লাহ হে চাচা হে চাচা )( বলতে বলতে ছুটে আসে। আলী (রাঃ( তাকে কোলে তুলে নেন। এরপর আলী, জা'ফর ও যায়েদ বিন হারেছাহর মধ্যে বিতর্ক হয়। কেননা সবাই তাকে নিতে চান। তখন রাসূল (ছাঃ) জা'ফরের অনুকূলে ফায়ছালা দেন। কেননা জা'ফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস )( ছিলেন মেয়েটির আপন খালা। এ সময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খালা হ'লেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত' হামযা-কন্যার পাঁচটি নাম এসেছে। যথাক্রমে 'উমারাহ, ফাতেমা, উমামাহ, আমাতুল্লাহ ও সালমা। তন্মধ্যে প্রথম নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ'।

উল্লেখ্য যে, 'উমরাতুল ক্বাযা আদায়ের মাধ্যমেই সূরা ফাৎহ ২৭ আয়াত-এর ভবিষ্যদ্বাণী । 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। এমনভাবে যে, তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। অতঃপর তিনি দিবেন তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয়'। অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি। যার ফলে পরবর্তী বছর নিরাপদে ক্বাযা ওমরাহ আদায়ের সুযোগ হয়।

## ক্বযা ওমরাহ পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

**সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা** )( :

ক্বাযা ওমরাহ থেকে ফিরেই ৭ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বনু সুলায়েম )( গোত্রকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ৫০ জনের এই দলটিকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা তাদের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে বলে 'তোমরা যেদিকে আমাদের আহ্বান করছ, আমাদের তাতে কোন প্রয়োজন নেই'। অতঃপর তারা মুসলিম দাঈ দলটির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ত্বাবারী বলেন, সেনাপতি সহ মুসলিম পক্ষের সবাই শহীদ হন। তিনি বলেন, ওয়াক্বেদী ধারণা করেন যে, সবাই শহীদ হন। তবে সেনাপতি আহত

অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। তারা ৮ম হিজরীর ১লা ছফর মদীনায় ফিরে আসেন।

**সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী** )( :

৮ম হিজরীর ছফর মাস। ২০০ লোকের একটি সেনাদল নিয়ে তিনি ফাদাক অঞ্চলের বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন বশীর বিন সা'দের ৩০ জন সাথীর শাহাদাত স্থলে। যা ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল (ক্রমিক সংখ্যা ৬১ দ্রঃ)। শত্রুদের অনেকে নিহত হয় ও বহু গবাদিপশু হস্তগত হয় ।

**. সারিইয়া যাতু আত্বলাহ** )( :

৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মুসলমানদের উপরে হামলা করার জন্য বনু কুযা'আহ )( বিরাট একটি দলকে একত্রিত করছে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'ব বিন ওমায়ের আনছারীর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সেখানে প্রেরণ করেন। তারা 'যাতু আতুলাহ' )( নামক স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি হন। তাঁরা প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যাতে সকল ছাহাবীকে তীর দিয়ে ছিদ্র করে করে মর্মান্তিকভাবে শহীদ করা হয়। যাদের মধ্যে একজন মাত্র কোনভাবে বেঁচে যান

**. সারিইয়া যাতু ইরকু** )( :

৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু হাওয়াযেন গোত্র বারবার শত্রুদের সাহায্য করে যাচ্ছিল। ফলে তাদের দমনের জন্য শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদীর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল উক্ত গোত্রের যাতু ইরকু )( নামক স্থানে প্রেরিত হয়। যুদ্ধ হয়নি। তবে কিছু গবাদিপশু হস্তগত হয় (আর-রাহীকু ৩৮৬ পৃঃ)। যাতু ইরকু হ'ল ইরাকবাসীদের জন্য হজ্জের মীক্বাত। যা মক্কা থেকে উত্তরে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

# মুতার যুদ্ধ

৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা

ওমরাতুল ক্বাযা থেকে ফিরে এসে যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিনগুলিসহ পরবর্তী চার মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনার নিরাপত্তা বিধান ও শাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিষ্টান শাসকদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে জুমাদাল উলা মাসে এই অভিযান প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান । এ যুদ্ধের কারণ হিসাবে ওয়াক্বেদী যা বর্ণনা করেছেন, তা বিদ্বানগণের নিকট গ্রহণযোগ্য না হ'লেও এটা নিশ্চিত যে,
‘আল্লাহ যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য কারণ সমূহ সৃষ্টি করে দেন।’

অতএব বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ কারণ নিশ্চয়ই কিছু ছিল। যার জন্য যুদ্ধ যাত্রা অপরিহার্য হয়েছিল। তবে এটা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করার পর এবং হোদায়বিয়াতে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান রোমক শক্তিকে পদানত করা ও ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করা মুতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছিলেন শাম ও পারস্যে রাজত্বকারী রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু করতে। যা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সুসম্পন্ন হয়।

যায়েদ বিন হারেছাত্র নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের অত্র বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী বুছরার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানীর ছিল প্রায় ২ লাখ খ্রিষ্টান সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী (ইবনু হিশাম ২/৩৭৫)। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'তা )( নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর তিনজন

সেনাপতি শহীদ হ'লে সকলের পরামর্শে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

এই বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে যায়েদ বিন হারেছাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি যায়েদ নিহত হয়, তবে তার স্থলে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সেনাপতি হবে। যদি সে নিহত হয়, তাহ'লে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে (বুখারী হা/৪২৬১)। বস্তুতঃ এই ধরনের সাবধানতা ছিল এটাই প্রথম (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৭)।

মুসলিম বাহিনী শামের মা'আন (১) অঞ্চলে অবতরণ করে। অতঃপর তারা হঠাৎ জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এসময় এক লাখ সৈন্য নিয়ে শামের বালকা অঞ্চলের মাআবে )( অবস্থান করছেন। সেখানে তার সাথে যোগ হয়েছে লাখাম, জুযাম, ক্বাইন )(, বাহরা ও বালী প্রভৃতি আরব-খ্রিষ্টান গোত্র সমূহের আরো এক লাখ যোদ্ধা। অভাবিতভাবে বিরোধী পক্ষের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েন। অতঃপর পরামর্শ সভায় বসেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের মত। যেখানে পূর্ব থেকে কেউ জানতেন না যে, তারা এত বড় একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের সম্মুখীন হবেন। সভায় কেউ মত প্রকাশ করেন যে, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে শত্রু সংখ্যার খবর দিয়ে পত্র লিখি। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবেন অথবা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিবেন, তাই করব। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ওজস্বিনী ভাষায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

‘হে আমার কওম! আল্লাহ্র কসম! তোমরা যেটাকে অপসন্দ কর, নিশ্চয় তোমরা সেটা অন্বেষণের জন্যই বের হয়েছ। আর তা হ'ল 'শাহাদাত'। আমরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিনা সংখ্যা দ্বারা, শক্তি দ্বারা বা আধিক্য দ্বারা। আর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করিনা কেবলমাত্র এই দ্বীনের স্বার্থ ব্যতীত। যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে বাড়ুন। নিশ্চয় এর মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি কল্যাণের একটি রয়েছে। হয় বিজয় নয় শাহাদাত। অতঃপর সকলে বললেন, অবশ্যই, আল্লাহ্র কসম! ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছেন'। এরপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে ৮ লাইনের একটি স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা পাঠ করেন'।

অতঃপর সকলে নতুন উদ্দীপনায় স্রেফ আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং দু'দিন পর যুদ্ধে রওয়ানা হন ও মুতা (( নামক স্থানে খ্রিষ্টান বাহিনীর মুখোমুখি হন। অতঃপর তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব যুদ্ধের ঝাণ্ডা তুলে নেন। এসময় তাঁর ঘোড়া শাকুরা )( নিহত হয়। অতঃপর মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় তাঁর ডান হাত কর্তিত হয়। তখন তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরেন। এরপর বাম হাত কর্তিত হয়। তখন বগলে ঝাণ্ডা চেপে ধরেন। অতঃপর তিনি শহীদ হন। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান। তখন সকলের পরামর্শক্রমে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সীসাঢালা ঐক্য, অপূর্ব বীরত্ব, অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্য, নিখাদ শাহাদাতপ্রিয়তা, খালেদের অতুলনীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বিশাল বিজয় সাধিত হয়। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন')। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালেদ বিন অলীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল' (, তাতে অনুমান করা চলে কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল 'খন্দক' যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

**ম'জিযা**

এ যুদ্ধে রাসূল ( সাঃ) থেকে মুজেজা প্রকাশিত হয়। যেমন মদিনায় খবর পৌঁছার পূর্বেই তিনি সকলকে সেনাপতিদের পরপর শাহাদাতের খবর দেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, 'অবশেষে ঝান্ডা হাতে নিয়েছে আল্লাহর তরবারি সমূহের অন্যতম তরবারি অতঃপর আল্লাহ তাদের হাতে বিজয় দান করেছেন।'

**মুতার শহীদদের মর্যাদা :**

(১) মদীনায় অশ্রুসজল নেত্রে শহীদগণের খবর দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাদেরকে এ বিষয়টি খুশী করবে না যে, তারা আমাদের কাছে থাকুক' (বুখারী

হা/২৭৯৮)। অর্থাৎ তারা জান্নাতে অবস্থান করাতেই খুশী হয়ে গেছে। দুনিয়াতে তারা থাকতে চায় না' (ফাহুল বারী হা/২৭৯৮-এর ব্যাখ্যা)।

(২) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জা'ফর বিন আবু ত্বালিব জিব্রীল ও মীকাঈল-এর সাথে দু'টি ডানাসহ অতিক্রম করার সময় আমাকে সালাম করল। অতঃপর যুদ্ধে তার দু'হাত হারানোর ঘটনা বর্ণনা করল। এ কারণে জান্নাতে সে জা'ফর আত-ত্বাইয়ার )( 'উড়ন্ত জা'ফর' নামে অভিহিত হয়েছে'। তিনি বলেন, আমি জা'ফরকে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে দুই ডানায় উড়তে দেখেছি' (ছহীহাহ হা/১২২৬)। এজন্য তাঁকে 'যুল-জানাহাইন' )( 'দুই ডানা ওয়ালা' বলা হয়ে থাকে (মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৭৪৩-এর ব্যাখ্যা)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জা'ফর বিন আবু ত্বালিবের সন্তানদের ডেকে এনে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের অভিভাবক' (।

## মুতা পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

**সারিইয়া যাতুস সালাসেল( :**

৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। মুতার যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পরপরই আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রথমে ৩০০ এবং পরে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০০ মোট ৫০০ সৈন্যের এই দলটি সিরিয়া সীমান্তে বনু কুয়া'আহ ) গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এরা রোমকদের সঙ্গে মিলে মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী উক্ত গোত্রের 'সালসাল' )( নামক প্রস্রবণের নিকটে অবতরণ করে বিধায় অভিযানটির নাম হয় 'যাতুস সালাসেল'। শত্রুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। শেষোক্ত সাহায্যকারী বাহিনীতে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল 'আছকে সেনাপতি করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর দাদী ছিলেন অত্র এলাকার 'বালী' )( গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। যাতে তারা রোমকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।

এ যুদ্ধে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মত প্রথম যুগের জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণের উপরে নতুন মুসলিম আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে সেনাপতি নিয়োগ করার মধ্যে প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ও পারিপার্শ্বিক কারণে অনেক সময় অনুত্তম ব্যক্তিকে উত্তম ব্যক্তিগণের উপরে নেতৃত্ব অর্পণ করা যায়।

এই যুদ্ধে প্রচণ্ড শীতে মৃত্যুর আশংকায় আমর ইবনুল 'আছ সূরা নিসা ২৯ আয়াতের আলোকে ইজতিহাদ করে ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাতে ইমামতি করেন। এ খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি হেসে ফেলেন। কিন্তু কিছু বলেননি' (আবুদাউদ হা/৩৩৪, সনদ ছহীহ)। অর্থাৎ তিনি তাঁর এই ইজতিহাদের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতে বুঝা যায় যে, এমন অবস্থায় এটি করা জায়েয।

**সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ** )( :

৮ম হিজরীর শা'বান মাস। নাজদের বনু গাত্বফানের শাখা 'মুহারিব' )( গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলার জন্য তাদের এলাকায় খাযেরাহ )( নামক স্থানে সেনাদল প্রস্তুত করছে জানতে পেরে ১৫ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। তারা তাদের অনেককে হত্যা করেন ও বাকীরা পালিয়ে যায়। অনেক গণীমত হস্তগত হয়। তারা এ সফরে ১৫ দিন মদীনার বাইরে থাকেন।

## মক্কা বিজয়

৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান ৭৩২ মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার ১০,০০০ ছাহাবী নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনা হ'তে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোমবার এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা

বিজয় সম্পন্ন হয়। ৭০০ মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুহুম কুলছুম ) ( বিন হোছায়েন আল-গেফারী। এটি ছিল একটি সিদ্ধান্ত কারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যতার ব্যাপারে সমগ্র আরব বিশ্বে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বে কা'বাগৃহের উপর কর্তৃত্বের কারণে মানুষ কুরায়েশ নেতাদের প্রতি একটা অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য পোষণ করত। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, নবীকুল শিরোমণি শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল। বিজয়ী রাসূল (ছাঃ) তাদের কারু প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'। কিন্তু কি ছিল এর কারণ? কিভাবে ঘটলো হঠাৎ করে এ ঐতিহাসিক বিজয়? দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাযার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল, তারা কোথা থেকে কিভাবে দশ হাযার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধমকেতুর মত আবির্ভূত হ'ল মক্কার উপরে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মক্কার নেতারা ফ্যালফ্যাল করে। টু শব্দটি করার সাহস কারু হ'ল না? নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনার সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল তাওহীদবাদী মুসলমান। কা'বাগৃহ হ'ল মূর্তিশূন্য। 'উয্যার বদলে শুরু হ'ল আল্লাহর জয়গান। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হ'ল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস। কি সে কারণ? কিভাবে সম্ভব হ'ল এই অসম্ভব কাণ্ড? এক্ষণে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করব।-

প্রায় দু'বছর পূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সম্পাদিত হোদায়বিয়ার চার দফা সন্ধিচুক্তির তৃতীয় দফায় বর্ণিত ছিল যে, 'যে সকল গোত্র মুসলমান বা কুরায়েশ পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তাদের কারু উপরে অত্যাচার করা হ'লে সংশ্লিষ্ট দলের উপরে অত্যাচার বলে ধরে নেওয়া হবে'। উক্ত

শর্তের আওতায় মক্কার নিকটবর্তী গোত্র বনু খোযা'আহ ) মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর )( কুরায়েশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট দলের মিত্রপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু দু'বছর পুরা না হ'তেই বনু বকর উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করল এবং ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে রাত্রির অন্ধকারে বনু খোযা'আহ্র উপরে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করল। ঐসময় বনু খোযা'আহ গোত্র 'ওয়াতীর' )( নামক প্রস্রবণের ধারে বসবাস করত, যা ছিল মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত (মু'জামুল বুলদান)।

বনু বকরের এই অন্যায় আক্রমণে কুরায়েশদের ইন্ধন ছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। এমনকি কুরায়েশ নেতা ইকরিমা বিন আবু জাহল, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং খোদ হোদায়বিয়া সন্ধিচুক্তিতে কুরায়েশ পক্ষের আলোচক ও স্বাক্ষর দানকারী সোহায়েল বিন 'আমর সশরীরে উক্ত হামলায় অংশগ্রহণ করেন।

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান শুক্রবার ১০,০০০ সাথী নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে যান আবু রুহুম কুলছম আল-গেফারী-কে (হাকেম হা/৬৫১৭)। মুহাজির ও আনছারদের সকলেই অত্র অভিযানে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত মদীনার আশপাশের নওমুসলিম গোত্রসমূহ যেমন আসলাম, গেফার, মুযায়না, জোহায়না, বনু সোলায়েম, আশজা' প্রভৃতি গোত্র সমূহ এই সাথে গমন করে। এদের মধ্যে মুযায়না গোত্রের এক হাযার ও বনু সুলায়েম-এর এক হাযার সৈন্য ছিল' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৭৪)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন। সাথীগণের কেউ ছায়েম ছিলেন, কেউ ছিলেন না। অতঃপর মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরে কুরাউল গামীম পৌঁছে তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন এবং তা উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে পান করে দিনের বেলায় ছিয়াম ভঙ্গ করলেন'... (মুসলিম হা/১১১৩-১৪)। স্থানটি ছিল আমাজ ও ওসফানের মধ্যবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে(। ) কুদাইদ ছিল মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরে একটি ঝর্নার নাম।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে উনিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সর্বদা মানুষকে তাক্বওয়ার উপদেশ দেন এবং হেদায়াতের রাস্তাসমূহ

বাৎলিয়ে দিতে থাকেন। আবু উসায়েদ আল-খোযাঈকে দিয়ে হারাম শরীফের নতুন সীমানা স্তম্ভসমূহ খাড়া করেন। ইসলামের প্রচারের জন্য এবং মূর্তিসমূহ, ভেঙ্গে ফেলার জন্য চারদিকে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। এছাড়া ঘোষকের মাধ্যমে মক্কার - 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার বাড়ীতে রক্ষিত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে'।

## হোনায়েনের যুদ্ধ

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস

হাওয়াযেন ও ছাক্বীফ গোত্রের আত্মগর্বী নেতারা মক্কা হ'তে আরাফাতের দিকে ১০ মাইলের কিছু বেশী দক্ষিণ-পূর্বে হোনায়েন উপত্যকায় মালেক বিন 'আওফের নেতৃত্বে ৪০০০ দুর্ধর্ষ সেনার সমাবেশ ঘটায়। ফলে মক্কা বিজয়ের ১৯তম দিনে ৬ই শাওয়াল শনিবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কার ২০০০ নওমুসলিমসহ মোট ১২,০০০ সাথী নিয়ে হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১০ই শাওয়াল বুধবার রাতে গিয়ে উপস্থিত হন। যুদ্ধে বিরাট পরিমাণের গণীমত হস্তগত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

মুসলমানদের আকস্মিক মক্কা বিজয়কে কুরায়েশ ও তাদের মিত্রদলগুলি মেনে নিলেও প্রতিবেশী বনু হাওয়াযেন ও তার শাখা তায়েফের বনু ছাক্বীফ গোত্র এটাকে মেনে নিতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, হাওয়াযেন ও কুরায়েশ দু'টিই বনু মুযার বংশোদ্ভূত। মুযার ছিলেন হাওয়াযেনের ৬ষ্ঠ দাদা এবং কুরায়েশের ৭ম অথবা ৫ম দাদা। উভয়ের মধ্যে বংশগত ও আত্মীয়তাগত গভীর সম্পর্ক ছিল। মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ত্বায়েফের দূরত্ব মাত্র ৯০

কি. মি.। সেখানে কুরায়েশদের বহু ভূ-সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা ছিল। সেকারণ তায়েফকে 'কুরায়েশদের বাগিচা' )( বলা হয়।

হাওয়াযেন গোত্রের অনেকগুলি শাখা ছিল। তন্মধ্যে ছাক্বীফগণ তায়েফে এবং অন্যেরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী তেহামায় বসবাস করত। ছাক্বীফদের এলাকাতেই আরবদের বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহ অবস্থিত ছিল। যেমন ওকায বাজার। যেটি নাখলা ও ত্বায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। যুলমাজায, যা আরাফাতের নিকটবর্তী এবং মাজান্নাহ, যা মারুয যাহরানে অবস্থিত ছিল। ফলে ব্যবসায়িক কারণেও কুরায়েশ ও ছাক্বীফদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল এবং কুরায়েশ ও হাওয়াযেন উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন ছিল। যেকারণে উরওয়া বিন মাসউদ ছাক্বাফী কুরায়েশদের প্রতিনিধি হিসাবে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে অন্যতম আলোচক হিসাবে প্রেরিত হন

ছাক্বীফদের ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ, যা প্রাকৃতিকভাবে চারদিক দিয়ে ত্বায়েফের দুর্গম খাড়া পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাদের নির্মিত মযবুত দরজাসমূহ ব্যতীত সেখানে প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। সে যুগের সেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এই দুর্গে পুরা এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত থাকত ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই মাক্কী জীবনে সেখানে ইসলামের

দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত কবুল করেনি। বরং নির্যাতন করে তাঁকে বের করে দেয়। কুরায়েশদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধের মধ্যে হাওয়াযেন গোত্র জড়ায়নি। কারণ তারা হয়ত ভেবেছিল, কুরায়েশ একাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তারা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়। এমনকি তারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই শংকিত হয়ে পড়ে। সেকারণ তারা শিরকের ঝাণ্ডা উন্নীত করে সকল কুফরী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। এতদুদ্দেশ্যে তারা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী বনু মুযার ও বনু হেলাল এবং অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিল। এরা সবাই ছিল কায়েস

বিন 'আয়লানের বংশধর। তবে বনু হাওয়াযেন-এর দু'টি শাখা বনু কা'ব ও বনু কেলাব এই অভিযান থেকে দূরে থাকে' (ইবনু হিশাম ২/৪৩৭)।

অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হাওয়াযেন নেতা মালেক বিন 'আওফ আন-নাছরীর ) নেতৃত্ব চার হাযার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ

বাহিনী হোনায়েন-এর সন্নিকটে আওত্বাস )( উপত্যকায় অবতরণ করে। যা ছিল হাওয়াযেন গোত্রের এলাকাভুক্ত। তাদের নারী-শিশু, গবাদিপশু ও সমস্ত ধন-সম্পদ তারা সাথে নিয়ে আসে এই উদ্দেশ্যে যে, এগুলির মহব্বতে কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাবে না। তাদের ১২০ বছর বয়সী প্রবীণ অন্ধ নেতা ও দক্ষ যোদ্ধা দুরাইদ বিন ছিম্মাহ  এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তোমরা এগুলিকে দূরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দাও। যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হ'লে ওরা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। আর পরাজিত হ'লে ওরা বেঁচে যাবে'। ৭৯৩ কিন্তু তরুণ সেনাপতি মালেক বিন 'আওফ তার এ পরামর্শকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেয় এবং সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে জমা করে।

৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শনিবার মক্কা থেকে ২০০০ নওমুসলিম সহ ১২,০০০ সেনাদল নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এদের মধ্যে অনেক চুক্তিবদ্ধ মুশরিক মিত্র ছিল। যেমন ছাফওয়ান বিন উমাইয়া। যুদ্ধযাত্রাকালে রাসূল (ছাঃ) তার নিকট থেকে ১০০ বর্ম ধার নিয়েছিলেন তার সরঞ্জামাদিসহ। ঐ অবস্থায় তিনি হোনায়েন যুদ্ধে গমন করেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলাম কবুলের জন্য চার মাসের সময় দিয়েছিলেন। এই সময় আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করা হয় যিনি ছালাতে ইমামতি করবেন এবং মু'আয বিন জাবলকে রেখে যান দ্বীন শিক্ষা দানের জন্য ।

ভোর রাতের অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী হোনায়েন পৌঁছল।

শত্রুপক্ষের ছাক্বীফ ও হাওয়াযেন গোত্রের দক্ষ তীরন্দাযরা সেখানে আগেই ওঁৎ পেতে ছিল। তারা গিরিসংকটের সংকীর্ণ পথে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দলকে নাগালের

মধ্যে পাওয়া মাত্রই চারদিক থেকে তীরবৃষ্টি শুরু করে দিল। তাদের এ আকস্মিক হামলায় মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সবাই দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটতে লাগল। বিভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলেন ৪, ৯, ১০, ১২, ৮০ অথবা সর্বোচ্চ ১০০ জন লোক' (ফাহুল বারী হা/৪৩১৫-এর আলোচনা)। হ'তে পারে শুরুতে ৪জন এবং পরে সংখ্যা বাড়তে থাকে।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) মুসলিম বাহিনীর ডান দিকে অবস্থান করছিলেন। এ সময় হাওয়াযেন বাহিনীর সম্মুখভাগে কালো পতাকাবাহী জনৈক সুসজ্জিত ব্যক্তি লাল উটে সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। সে যাকেই পাচ্ছিল তাকেই মেরে দিচ্ছিল। হযরত আলী ও একজন আনছার ছাহাবী তাকে টার্গেট করেন। অতঃপর তার উটের পিছন পায়ের হাঁটুর স্থানে আঘাত করেন। তাতে লোকটি পিছন দিকে পড়ে যায়। অতঃপর আনছার ব্যক্তি তার পায়ের নলায় আঘাত করলে তা দু'টুকরা হয়ে পতিত হয়। তারপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে পরাজয় এসে যায়। এ সময় ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই কালাদাহ বিন হাম্বল বলল, 'দেখ জাদু আজ ব্যর্থ হয়ে গেল'। একথা শুনে ছাফওয়ান

বললেন, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন, চুপ কর, আল্লাহ তোমার চেহারাকে বিকৃত করুন! আল্লাহর কসম! কুরায়েশ-এর কোন ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় হাওয়াযেন-এর কোন ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হওয়ার চাইতে'। পালানোর এ দৃশ্য দেখে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব, যিনি মাত্র ২০ দিন আগে মুসলমান হয়েছেন, তিনি বলে ওঠেন সাগরে পৌছানোর আগ পর্যন্ত এদের পালানোর গতি শেষ হবে না'।

এভাবে প্রথম ধাক্কাতেই এদের ঈমান ভঙ্গুর হয়ে গেল এবং পূর্বের কুফরীতে ফিরে যাবার উপক্রম হ'ল। যারা মূলতঃ গণীমত লাভের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। ঈমানের স্বাদ এবং আল্লাহর পথে জিহাদের মহব্বত তাদের অন্তরে তখনও প্রবিষ্ট হয়নি। মুসলিম বাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হ'লে হয়তোবা তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যেতেন।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা ) ( :

শায়বা বিন ওছমান বিন আবু তালহা আল-'আবদারী আল-হাজাবী, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন এবং হোনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে বিপর্যয়কর অবস্থায় যখন রাসূল (ছাঃ) খচ্চর থেকে নেমে পড়েন, তখন তাঁকে সুযোগ পেয়ে হত্যা করার অপচেষ্টা চালান। কারণ তার পিতা ওছমান বিন আবু তালহা ওহোদ যুদ্ধের দিন আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। তিনি বলেন, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে, আরব-আজমের সবাই যদি মুহাম্মাদের অনুসারী হয়, আমি কখনই তাঁর অনুসারী হবো না। ফলে যখন আমি মক্কা থেকে যুদ্ধে বের হই, তখন থেকেই আমি সুযোগের সন্ধানে থাকি। অতঃপর আমি সুযোগ পেয়ে তাঁর নিকটবর্তী হই এবং হত্যার জন্য তরবারী উঠাই। হঠাৎ আমার সামনে বিদ্যুতের চমকের ন্যায় একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে। যা আমাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার উপক্রম করে। আমি ভয়ে চোখে হাত দেই। তখন রাসূল (ছাঃ) আমার দিকে তাকান ও আমাকে ডেকে বলেন, হে শায়বা আমার নিকটে এসো! আমি তাঁর নিকটে গেলাম। অতঃপর তিনি আমার বুকে হাত রেখে বললেন,
'হে আল্লাহ! তুমি একে শয়তান থেকে পানাহ দাও'। এতে আমার ভিতরের সব উত্তেজনা দূর হয়ে গেল। আল্লাহ্র কসম! তখন তিনি আমার নিকটে আমার জীবনের চাইতে প্রিয় হয়ে যান'। আমৃত্যু তাঁর ইসলাম সুন্দর ছিল। ৫৮ বা ৫৯ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের দিন তার চাচাতো ভাই ওছমান বিন ত্বালহাকে রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহের চাবি হস্তান্তর করেন' (আল-ইছাবাহ, ওছমান বিন তালহা ক্রমিক ৫৪৪৪)।

হোনায়েন-এর সংকটকালে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউ ছিলনা, তখন তাঁর বীরত্ব ও তেজস্বিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি স্বীয় সাদা খচ্চরকে কাফের বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকেন ও বলতে থাকেন, * 'আমি নবী। মিথ্যা নই'। 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র'। অর্থাৎ আমি যে সত্য নবী তার প্রমাণ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপরে নির্ভর করে না। এ সময় রাসূল (ছাঃ) ডানদিকে

ফিরে ডাক দিয়ে বলেন, 'আমার দিকে এসো হে লোকেরা! আমি আল্লাহর রাসুল। আমি আব্দুল্লাহ পুত্র মোহাম্মদ।

আল্লাহ্র রাসূল'। 'আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ'।

এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ১০ থেকে ১২ জন ছাহাবী ব্যতীত কেউ ছিল না। তন্মধ্যে ছিলেন চাচা আব্বাস ও তার পুত্র ফযল বিন আব্বাস, চাচাতো ভাই নওমুসলিম আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব ও তার পুত্র জা'ফর, আবুবকর, ওমর, আলী ও রাবী'আহ বিন হারেছ। তাছাড়া ছিলেন উসামাহ বিন যায়েদ এবং আয়মান বিন ওবায়েদ ওরফে আয়মান বিন উম্মে আয়মান। যিনি ঐ দিন শহীদ হয়েছিলেন (যাদুল মা'আদ ৩/৪১১)। আবু সুফিয়ান বিন হারেছ রাসূল (ছাঃ)-এর খচ্চরের লাগাম এবং চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব খচ্চরের রেকাব টেনে ধরে রেখেছিলেন, যাতে সে রাসূলকে নিয়ে সামনে বেড়ে যেতে না পারে। অতঃপর চাচা আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন ছাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করার জন্য। কেননা আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দরাজ কণ্ঠের মানুষ। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ডাক দিলেন, 'বায়'আতে রিযওয়ানের সাথীরা কোথায়'? 'হে আনছারগণ!' 'হে হারেছ বিন খাযরাজের বংশধরগণ!' আব্বাস-এর উচ্চকণ্ঠের এই আওয়ায ( ) 1 লাব্বায়েক লাব্বায়েক ধ্বনি দিতে দিতে চারদিক থেকে ছাহাবীগণ ছুটে এলেন।৮০২ কারু কারু এমন অবস্থা হয়েছিল যে, স্বীয় উটকে ফিরাতে না পেরে স্রেফ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়ে ছুটে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে চলে আসেন (ইবনু হিশাম ২/৪৪৪-৪৫)। এসময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এখন যুদ্ধ জ্বলে উঠল'

ফলে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুষ্টি বালু উঠিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করে বলেন, 'চেহারাগুলো বিকৃত হৌক'। এই এক মুঠো বালু শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের দু'চোখে ভরে যায় এবং তারা পালাতে থাকে। ফলে যুদ্ধের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুহাম্মাদের প্রতিপালকের কসম! ওরা পরাজিত হয়েছে'। নিঃসন্দেহে এটা ছিল আল্লাহ্র গায়েবী মদদ, যা তিনি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘ অতঃপর আল্লাহ তার রাসূল ও বিশ্বাসীগণের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করলেন

এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখোনি আর অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই হল অবিশ্বাসীদের কর্মফল' (তওবা ৯/২৬)।

বন্দী: ৬০০০ (নারী-শিশুসহ)। উট: ২৪,০০০। দুম্বা-বকরী: ৪০,০০০-এর অধিক।

রৌপ্য: ৪০০০ উক্বিয়া। এতদ্ব্যতীত ঘোড়া, গরু, গাধা ইত্যাদির কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সব সম্পদ একত্রিত করে 'জি'ইরানাহ' )( নামক স্থানে জমা রাখেন এবং মাসউদ বিন 'আমর আল-গেফারীকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ত্বায়েফ থেকে ফিরে অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি গণীমত বণ্টন করেননি। বন্দীদের মধ্যে হালীমার কন্যা রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ বোন নবতিপর বৃদ্ধা শায়মা বিনতুল হারেছ আস-সা'দিয়াহ )( ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। অতঃপর তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী তার কওমের নিকট ফেরৎ পাঠান'।

## হোনায়েন পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

**সারিইয়া ক্বায়েস বিন সা'দ :**

৮ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। হোনায়েন যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পর রাসূল (ছাঃ) কায়েস বিন সা'দ বিন ওবাদাহ-এর নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্যের একটি দলকে ইয়ামন সীমান্তবর্তী ছুদা অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তখন তাদের নেতা যিয়াদ ইবনুল হারেছ ছুদাঈ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন এবং অনুরোধ করে বলেন, আপনি সৈন্যদলকে ফিরিয়ে নিন। আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিচ্ছি'। তখন রাসূল (ছাঃ) সেনাদল ফেরত নিলেন।

**সারিইয়া উয়ায়না বিন হিছন আল-ফাযারী:**

হিজরীর মুহাররম মাস। বনু তামীম গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের জিযিয়া প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত করছিল। সেকারণ তাদের বিরুদ্ধে 'ছাহরা' )( এলাকায় ৫০ জন অশ্বারোহীর একটি দল প্রেরিত হয়। বনু তামীম পালিয়ে যায়। তাদের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে ৬২ জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। পরদিন তাদের ১০ জন নেতা মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করে। ফলে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়।

**. সারিইয়া কুত্বাহ বিন 'আমের( :**

৯ম হিজরীর ছফর মাস। তুরবার )( নিকটবর্তী তাবালা (ম) অঞ্চলে খাছ'আম (ক) গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে ২০ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। যুদ্ধে তাদের অনেকে হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনী উট, বকরী ও নারী সহ অনেক গণীমত নিয়ে ফিরে আসে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ছেড়ে দেন।

**সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী :**

৯মহিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই দলটিকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বনু কেলাব তাতে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের একজন নিহত হয় (যাদুল মা'আদ ৩/৪৫০; ইবনু সা'দ ২/১২৩)।

**সারিইয়া আলী ইবনু আবী তালেব :**

৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বিখ্যাত খ্রিষ্টান গোত্র ত্বাঈ (র্ড)-এর 'ফুল্লস' )( মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ১৫০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। মূর্তি ভাঙ্গার পর দানবীর হাতেম তাঈ-এর পরিবার সহ অনেকে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হন। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) তাদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেন। হাতেম তাঈ-এর বৃদ্ধা কন্যা সাফফানাহ (মর্মার্থ) মুক্তি পেয়ে পলাতক ভাই খ্যাতনামা বিদ্বান ও গোত্রনেতা 'আদী ইবনে হাতেমকে পাবার জন্য সিরিয়ায় যান। পরে 'আদী মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন (যাদুল মা'আদ ৩/৪৫৩)।

**সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজাযযিয আল-মুদলেজী ) :**

৯ম হিজরীর রবীউল আখের। হাবশার কিছু নৌদস্যু জেদ্দা তীরবর্তী এলাকায় সমবেত হয়ে মক্কায় হামলা করার চক্রান্ত করছে জানতে পেরে ৩০০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। আলক্বামা একদল সাথী নিয়ে সাগরে নেমে যান ও একটি দ্বীপে পৌছে যান। এ খবর পেয়ে দস্যুদল দ্রুত পালিয়ে যায়।

অতঃপর পলাতকদের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে পাঠানো হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তিনি ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং তার মধ্যে ঠাট্টা করার মেযাজ ছিল। আমি ছিলাম উক্ত সেনাদলের সদস্য। অতঃপর সেনাদল রাস্তার এক স্থানে অবতরণ করে। সেখানে তারা শরীর গরম করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার কথা শোনা ও মান্য করা কি তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়? সবাই বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ দিলে তোমরা কি তা পালন করবে? সকলে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি চাই তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দাও। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, তারা ঝাঁপ দিবে, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা থাম। আমি তোমাদের সাথে স্রেফ হাসি-ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম মাত্র। পরে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি বলেন,

যে ব্যক্তি তোমাদের কোন পাপকর্মের নির্দেশ দিবে, তোমরা তা মানবে না'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে সূরা নিসা ৫৯ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের...' (নিসা ৪/৫৯; মুসলিম হা/১৮৩৪)।

অনুরূপ একটি ঘটনা আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যেখানে আমীর হিসাবে বলা হয়েছে, 'আনছারের জনৈক ব্যক্তি' ) । তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তার সেনাদলকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন একদল তাতে প্রবেশ করার সংকল্প করল। অপর দল একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছিলাম'। তখন আমীরের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও আগুন নিভে যায়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর আগুনে প্রবেশ করত, তাহ'লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও র্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও র্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে'। ইমাম নববী বলেন, এটি আব্দুল্লাহ বিন হুযাফার ঘটনা নয়। বরং পৃথক ঘটনা (মুসলিম হা/১৮৪০-এর ব্যাখ্যা)।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত' এর অর্থ 'যদি তারা আমীরের নির্দেশ মান্য করার জন্য এটাকে হালাল ভেবে করত, তাহ'লে তারা সেখান থেকে আর কখনো বের হ'তে পারত না'। যারা আগুনে প্রবেশ করেনি, তাদেরকে তিনি উত্তম কথা বলেন ও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কারো প্রতি আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল বৈধ কর্মে' (ফাহুল বারী হা/৪০৮৫-এর ব্যাখ্য)। তিনি বলেন, নিসা ৫৯ আয়াতে বর্ণিত উলুল আমরের অর্থ 'আমীরের আনুগত্য' আলেমের আনুগত্য নয়। যা তাদের বিপরীত যারা উক্ত কথা বলে থাকেন। এর উদ্দেশ্য সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা। নইলে বহু আনুগত্যের ফলে সমাজে বিভক্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে

উপরোক্ত ঘটনায় আমীরের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেই সাথে উক্ত আনুগত্যের সীমা নির্দেশও জানা যায়। এছাড়া ইসলামী জিহাদের চিরন্তন বিধান পাওয়া যায় এই মর্মে যে আমিরের নির্দেশে আত্মঘাতী হওয়া নিষিদ্ধ।

# তাবূক যুদ্ধ

মুতার যুদ্ধে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের ১৩ মাস পর এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান। আর এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অংশগ্রহণে তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ।

এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ এবং রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০-এর বেশী। যাদের মধ্যে লাখাম ও জুযামসহ অন্যান্য আরব খ্রিষ্টান গোত্রসমূহ ছিল। যারা ইতিমধ্যে শামের বালক্বা (ত্র) পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। গত বছরে মুতার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সরাসরি মদীনায় হামলার এই গোপন প্রস্তুতি নেয়। তাতে মদীনার সর্বত্র রোমক ভীতির ) সঞ্চার হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রতিরোধে রোমান সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলে তারা সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। রামাযান মাসে মুসলিম বাহিনী বিনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসে। এই অভিযান কালে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। পঞ্চাশ দিনের এই দীর্ঘ সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে এবং ২০ দিন তাবুকে অবস্থানে ব্যয়িত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

তায়েফ থেকে ফেরার কাছাকাছি ছয় মাস পরে ৯ম হিজরীর রজব মাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে এই অভিযান প্রেরিত হয় (ইবনু হিশাম ২/৫১৫-১৬)। তাবুক ছিল মদীনা থেকে ৭৭৮ কি. মি. উত্তরে সউদী আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি রোম সম্রাটের সিরিয় গবর্ণরের বিরুদ্ধে ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে পরিচালিত 'মুতা' অভিযানে এক অসম যুদ্ধে রোমকদের পিছু হটার ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়। তাতে যুগ যুগ ধরে রোমকদের শাসন-শোষণে নিষ্পিষ্ট আরবদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগরিত হয়। বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী রোম শাসিত শাম রাজ্যের জন্য তা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়।

এ সময় মদীনার আউস গোত্রের অন্যতম সাবেক নেতা এবং খাযরাজ গোত্রের উপরেও যার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, ধর্মগুরু আবু 'আমের আর-রাহেব ৮ম হিজরীর শেষ দিকে হোনায়েন যুদ্ধের পর সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে অবশেষে শামে (সিরিয়া) চলে যান। কেননা এটি তখন ছিল আরব ভূমিতে খ্রিষ্টান শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সেখানে গিয়ে 'নাছারা' হন। অতঃপর রোম সম্রাটকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন।

এ উদ্দেশ্যে মদীনার মুনাফিকদের সাথে তিনি পুরা যোগাযোগ রাখেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি মসজিদে ক্বোবার অদূরে 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ করান। যাতে মসজিদের আড়ালে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা যায়। ত্বাবারী যুহরীর বরাতে 'মুরসাল' সূত্রে (ত্বাবারী হা/১৭২০০) বর্ণনা করেন যে, বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রে মসজিদে ক্বোবা নির্মিত হ'লে তার প্রতি হিংসাবশে তার ভাই বনু গুম বিন 'আওফ গোত্রের লোকেরা এই মসজিদ নির্মাণ করে (কুরতুবী হা/৩৪৮৫)।

রোম সম্রাটকে আবু 'আমের বুঝাতে সক্ষম হন যে, মদীনায় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তার একটি বিরাট দল রয়েছে। যারা বাহ্যিকভাবে মুহাম্মাদের দলে মিশে আছে। বাইরে থেকে রোমকরা হামলা করলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং রোমকদের সহজ বিজয় লাভহবে। উল্লেখ্য যে, ওহোদ যুদ্ধে শহীদ এবং ফেরেশতারা যার লাশ গোসল করান, সেই বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা ছিলেন এই ফাসেক আবু 'আমেরের পুত্র। রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে অস্বীকার করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) তার নামকরণ করেন আবু 'আমের আল-ফাসেক )(। তাকে বদদো'আ করেন, যেন সে মদীনা থেকে দূরে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করে। পরে তিনি শামের ক্বিন্নাসরীন )( যেলায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি

একদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতা অন্যদিকে আবু 'আমেরের এই প্ররোচনা রোম সম্রাটকে মদীনা হামলায় উৎসাহিত করল। পূর্ণরূপে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই উঠতি ইসলামী শক্তিকে অংকুরে বিনাশ করার সংকল্প নিয়ে তারা ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। যাতে রোম সাম্রাজ্য সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিদ্রোহের হুমকি সৃষ্টি না হয়।

রোমকদের উক্ত হুমকি মুকাবিলা করাই ছিল তাবূক অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। দ্বিতীয় কারণ ছিল তাদের কুফরী আদর্শের হুমকি মুকাবিলা করা। কারণ তারা ছিল ইহুদীদের পরে আরবদের নিকটতম দুশমন শক্তি। আহলে কিতাব হ'লেও তাদের অধিকাংশ ত্রিত্ববাদের কুফরী আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে প্রকৃত তাওহীদের দিকে আহ্বান করা এবং অন্যদেরকে তাদের মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচানো এই অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর এটাই হ'ল ইসলামী জিহাদের মূল রূহ। যেমন আল্লাহ বলেন

হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। আজ দেখো যে আল্লাহ সব সময় মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন।

যাতে এর মাধ্যমে আরব উপদ্বীপ কাফেরমুক্ত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ যাতে এর মাধ্যমে আরব উপদ্বীপ কাফেরমুক্ত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিৎনা (কুফরী) শেষ হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' (আনফাল ৮/৩৯)।

প্রত্যক্ষ কারণ যেটাই থাক না কেন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সম্ভবতঃ এটাই যে, খন্দক, খায়বর, মুতা ও মক্কা বিজয় শেষে আরবের সমস্ত অঞ্চল থেকে যখন দলে দলে গোত্রনেতারা মদীনায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করছে, তখন বাকী শাম ও তৎসন্নিহিত খ্রিষ্টান শাসিত এলাকাগুলি ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হৌক। আলহামদুলিল্লাহ সেটাই হয়েছিল এবং কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই তাবুক অভিযানে খ্রিষ্টান শাসকরা সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। অতঃপর খেলাফতে রাশেদাহর সময় সমস্ত আরব উপদ্বীপ কাফেরমুক্ত হয়। ফালিল্লাহিল হাম্দ। যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিৎনা (কুফরী) শেষ হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' (আনফাল ৮/৩৯)।

প্রত্যক্ষ কারণ যেটাই থাক না কেন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সম্ভবতঃ এটাই যে, খন্দক, খায়বর, মুতা ও মক্কা বিজয় শেষে আরবের সমস্ত অঞ্চল থেকে যখন দলে দলে

গোত্রনেতারা মদীনায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করছে, তখন বাকী শাম ও তৎসন্নিহিত খ্রিষ্টান শাসিত এলাকাগুলি ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হৌক। আলহামদুলিল্লাহ সেটাই হয়েছিল এবং কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই তাবুক অভিযানে খ্রিষ্টান শাসকরা সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। অতঃপর খেলাফতে রাশেদাহর সময় সমস্ত আরব উপদ্বীপ কাফেরমুক্ত হয়। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

৯ম হিজরীর রজব মাসের এক বৃহস্পতিবারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবূকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সেনা অভিযান। এই সময় তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনছারীকে মতান্তরে সিবা' বিন উরফুত্বাহ আল-গিফারীকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলীকে তাঁর পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকরা তাকে সম্ভবতঃ ভীতু, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় গিয়ে পথিমধ্যে সেনাদলে যোগ দেন। তখন সেনাদল দু'তিন মনযিল অতিক্রম করে গেছে। আল্লাহ্র রাসূল )ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে সস্নেহে বলেন,

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নাও যে তুমি আমার নিকটে অনুরূপ হও যেমন হারুন ছিলেন মুসার নিকটে তবে পার্থক্য এই যে আমার পরে আর কোন নবী নেই।
এ কথা শুনে আলী (রা:) খুশিমনে মদিনায় ফিরে গেলেন।

সাধ্যমত দান-ছাদাক্বা করা সত্ত্বেও তা এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে প্রতি ১৮ জনের জন্য একটি করে উটের ব্যবস্থা হয়। যার উপরে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। অনুরূপভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় তারা গাছের ছাল-পাতা খেতে থাকেন। যাতে তাদের ঠোটগুলো ফুলে যায়।

পথিমধ্যে ব্যাপকভাবে পানি সংকটে পড়ায় সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে পানির অভিযোগ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে পানি প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ

বৃষ্টির মেঘ পাঠিয়ে দেন, যা বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করে। সেনাবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে এবং পাত্রসমূহ ভরে নেয়।

মুসলিম বাহিনীর তাবুকে উপস্থিতির খবর শুনে রোমক ও তাদের মিত্ররা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা মুকাবিলার হিম্মত হারিয়ে ফেলল এবং তারা তাদের সীমান্তের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তৎকালীন বিশ্বশক্তির এই বিনাযুদ্ধে পলায়ন সমস্ত আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির জন্য অযাচিতভাবে এমন সব রাজনৈতিক সুবিধানি এনে দিল, যা যুদ্ধ করে অর্জন করা সম্ভব হ'ত না। রোমকদের মিত্র শক্তিগুলি মদীনার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করল।

)১) আয়লার (মা) খ্রিষ্টান গবর্ণর ইউহান্নাহ বিন রু'বাহ )( রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সন্ধি করেন এবং তাঁকে জিযিয়া প্রদান করেন। (২) আযরুহ )( ও জারবা )(-এর নেতৃবৃন্দ এসে জিযিয়া প্রদান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রত্যেককে সন্ধির চুক্তিনামা প্রদান করেন, যা তাদের কাছে রক্ষিত থাকে। শুধুমাত্র জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জান-মাল-ইয্যত ও ধর্মের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। (৩) রাসূল (ছাঃ) দূমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা উকায়দিরের )( নিকটে ৪২০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনীসহ খালেদ বিন অলীদকে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি বলে দেন যে, তুমি তাকে জংলী নীল গাভী শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে' (বায়হাক্বী হা/১৯১১৪)। সেটাই হ'ল। চাঁদনী রাতে দুর্গটি পরিষ্কার দেখা যায়, এমন দূরত্বে পৌঁছে গেলে হঠাৎ দেখা গেল যে, একটি নীল গাভী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গদ্বারে শিং দিয়ে গুঁতা মারছে। এমন সময় উকায়দির গাভীটাকে শিকার করার জন্য লোকজন নিয়ে বের হ'লেন। এই সুযোগে খালেদ তাকে বন্দী করে ফেললেন। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়' (ইবনু হিশাম ২/৫২৬)। উকায়দিরকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আনা হ'ল। অতঃপর ২০০০ উট, ৮০০ গোলাম, ৪০০ লৌহবর্ম ও ৪০০ বর্ণা দেবার শর্তে এবং জিযিয়া কর প্রদানে স্বীকৃত হওয়ায় তার সঙ্গে সন্ধিচক্তি সম্পাদিত হ'ল। যেমন ইতিপূর্বে আয়লাহ, তাবুক, ও তায়মার সাথে সম্পাদিত হয়েছিল।

একইভাবে রোমকদের মিত্র অন্যান্য গোত্রসমূহ তাদের পুরানো মনিবদের ছেড়ে মুসলমানদের নিকটে এসে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

এভাবে একেবারেই বিনাযুদ্ধে এবং কোনরূপ জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই আল্লাহর গায়েবী মদদে মদীনার ইসলামী খেলাফতের সীমানা বিস্তৃত হয়ে রোম সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

## তাবুক পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

**সারিইয়া খালেদ বিন অলীদ :**

৯ম হিজরীর রজব মাস। বিনা যুদ্ধে বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবুকে অবস্থানকালেই পার্শ্ববর্তী দুমাতুল জান্দালের )( খ্রিষ্টান নেতা উকায়দিরের (( বিরুদ্ধে খালেদকে প্রেরণ করেন। খালেদ বিন অলীদ তাকে বন্দী করে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আনেন এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

**সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ বিন হারেছাহ :**

১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে শনিবার ওসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে শামের দিকে সর্বশেষ সেনাদল প্রেরণ করেন এবং নিজ হাতে যুদ্ধের পতাকা বেঁধে তার হাতে তুলে দেন। অতঃপর তাকে ফিলিস্তীনের তুখুম, বালকা, দারূম প্রভৃতি এলাকা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করার নির্দেশ দেন। এই দলে প্রথম যুগের মুহাজিরগণ ওসামার সাথে যোগ দেন। এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত সর্বশেষ সেনাদল (ইবনু হিশাম ২/৬৪১-৪২)।

মুহাজির ও আনছারদের জ্যেষ্ঠ ছাহাবীদের উপরে (১৮ বছরের) তরুণ ওসামাকে নেতৃত্ব প্রদান করায় কেউ কেউ এর সমালোচনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) অসুখের কষ্টের মধ্যেও মাথায় কাপড় বেঁধে বেরিয়ে আসেন ও মেম্বরে বসে হামদ ও ছানার পরে (ইবদু

হিশাম ২/৬৫০) লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, قَدْ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَه

'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তোমরা ওসামার ব্যাপারে মন্তব্য করেছ। অথচ সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। যদি তোমরা তার নেতৃত্বের সমালোচনা করে থাক, তবে তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা ইতিপূর্বে (মুতার যুদ্ধের সময়) সমালোচনা করেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম! সে যোগ্য ছিল। সে আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার পরে তার এই পুত্র আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত'।

() অতঃপর তিনি মেম্বর থেকে নেমে আসেন এবং লোকেরা দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করে। অতঃপর ওসামা তার সেনাদল নিয়ে বেরিয়ে যান এবং ৪/৫ কি. মি. দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে অবতরণ করেন। ইতিমধ্যে লোকেরা তার কাছে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মরণাপন্ন অবস্থার খবর দেয়। তখন সকলে অপেক্ষায় থাকেন আল্লাহর ফায়ছালা কি হয় তা দেখার জন্য' (ইবনু হিশাম ২/৬৫০)।

উসামা বিন যায়েদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চরম অবস্থার খবর শুনে আমি এবং আমার সাথে অন্যেরা মদীনায় ছুটে আসি। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করি। যখন সবাই চুপ ছিল। কেউ কথা বলছে না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার একটি হাত আকাশের দিকে উঁচু করলেন। অতঃপর সেটি আমার গায়ের উপর রাখলেন। তাতে আমি বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দো'আ করছেন'।

মূলতঃ রোম সম্রাটের অহংকার চূর্ণ করা এবং সিরিয়ার বালক্বা ও ফিলিস্তীন অঞ্চল অশ্বারোহীদের দ্বারা পদদলিত করে রোমকদের ভীত করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

তাছাড়া উসামাকে সেনাপতি করার অন্যতম কারণ এটাও হ'তে পারে যে, প্রায় সোয়া দু'বছর পূর্বে মুতায় রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন তার পিতা এবং তিনি সেখানেই শহীদ হয়েছিলেন। তাই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার স্বাভাবিক স্পৃহাকে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পথে পরিচালিত করা হয়। যেজন্য তাকে রওয়ানা করার

সময় তিনি শামের তুখুম, বালক্বা, দারূম প্রভৃতি এলাকা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করার নির্দেশ দেন। যেখানে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল এবং তার পিতাসহ তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সারিইয়া উসামা বিন যায়েদ সম্পর্কে ওয়াক্বেদীর সূত্রে বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার কোনটাই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে বুখারী হা/৪৪৬৮-৬৯-এর ব্যাখ্যায় ফাল্গুল বারীতে যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, তার অধিকাংশ বিশুদ্ধতার মানে উন্নীত নয়।

## ইহূদী চক্রান্ত সমূহ

মুসলমানেরা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এত বলত, যার অর্থ ভ্যাঁ 'আপনি আমাদের দেখাশুনা করুন'। কিন্তু ইহুদীরা তাদের হিব্রু ভাষায় এটিকে গালি হিসাবে বলত। তারা )বেওকূফী) কিংবা 'আমাদের মন্দ লোকটি' অর্থ নিত ও মুখ ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে উচ্চারণ করত। এমতাবস্থায় তাদেরকে রা'এনা বলতে নিষেধ করা হয় এবং তার পরিবর্তে 'উনযুরনা' )( বলার নির্দেশ দেওয়া হয়'। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদেরকে সালাম দেওয়ার সময় তারা আসসা-মু আলাইকুম )( বলত। অর্থাৎ 'তোমাদের মৃত্যু হৌক'।৮৯০

মদীনার তিনটি ইহুদী গোত্র বনু কায়নুক্বা, বনু নাযীর ও

বনু কুরায়যার নেতারা সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকত। অতঃপর বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কষ্টদায়ক ও বিদ্রূপাত্মক আচরণ শুরু করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সম্পদশালী ও মুসলমানদের প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষপরায়ণ ছিল বনু ক্বায়নুক্বা। ৮১১ ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন ও দু'সপ্তাহ অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর

তাদেরকে সর্বপ্রথম মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এরপর একই কারণে ৪র্থ হিজরীতে বনু নাযীরকে এবং ৫ম হিজরীতে বনু কুরায়যাকে বিতাড়নের মাধ্যমে মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করা হয়।

বনু নাযীর খায়বরে নির্বাসিত হয়ে সেখান থেকে কুরায়েশদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। যার ফলে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর হামলার মাধ্যমে ৫ম হিজরীতে 'খন্দক যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। খন্দকের যুদ্ধে মদীনার সর্বশেষ ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীকে সাহায্য করে। ফলে উক্ত যুদ্ধ শেষে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে পুনরায় বিতাড়নের জন্য ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একইভাবে তাদের চক্রান্তে মদীনায় রোমক হামলার আশংকা দেখা দেয়। ফলে ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধ ও ৯ম হিজরীতে সর্বশেষ তাবুক অভিযান সংঘটিত হয়। এমনকি ১১ হিজরীতে মৃত্যুর দু'দিন আগেও রোমক হামলা প্রতিরোধের জন্য রাসূল (ছাঃ) ওসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন।

এভাবে দেখা যায়, মদীনায় হিজরতের শুরু থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধের পিছনে ইহুদী চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার প্রচেষ্টাসমূহ :

হিজরতের পরদিন ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ছওর পাহাড়ের গুহামুখে ১০০ উটের পুরস্কার লোভী শত্রুদের ব্যর্থ চেষ্টা।

১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুম কর্তৃক হিজরতের সময় পথিমধ্যে হামলার ব্যর্থ চেষ্টা।

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে ইয়ামামাহ্ হানীফা গোত্রের নেতা ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী )( ইয়ামামার নেতা মুসায়লামাহ্র নির্দেশে রাসূল (ছাঃ(-

কে হত্যার জন্য ছদ্মবেশে মদীনায় আসছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্ সেনাদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। মদীনায় আনার পর তিনদিন মসজিদে নববীতে তাকে বেঁধে রাখা হয়। তারপর তাকে মুক্তি দিলে তিনি মুসলমান হয়ে মক্কায় ওমরাহ করতে যান এবং ইসলামের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) যখন একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন, তখন বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম নেতা ও কোষাধ্যক্ষ সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাকে বকরীর বিষমাখানো ভুনা রান হাদিয়া পাঠায়। রাসূল (ছাঃ) তার কিছু অংশ চিবিয়ে ফেলে দেন, গিলেননি। এভাবে আল্লাহ্র রহমতে তিনি বেঁচে যান।

৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ) একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে যান এবং তরবারিটি গাছে ঝুলিয়ে রাখেন। এ সময় গাওরাছ ইবনুল হারেছ নামক জনৈক বেদুঈন তরবারিটি হাতে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হুমকি দিয়ে বলে, এবার তোমাকে রক্ষা করবে কে? জবাবে রাসূল (ছাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আল্লাহ'। তখন তরবারিটি তার হাত থেকে পড়ে যায়।

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের সংকটকালে মক্কার নওমুসলিম শায়বা বিন ওছমান সুযোগ পেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য তরবারি উঠায়। কিন্তু হঠাৎ এক আগুনের ফুলকি এসে তার চেহারাকে ঝলসে দিয়ে যায়। ফলে তার হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে দো'আ করেন। ফলে সে তওবা করে।

৯ম হিজরীর রামাযান মাসে তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পথে এক সংকীর্ণ গিরিসংকটে ১২ জন মুখোশধারী মুনাফিকের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরিবিলি পেয়ে তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে জাদু :

হত্যা প্রচেষ্টা ছাড়াও তাঁকে জাদু করে পাগল বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে ষড়যন্ত্রকারীরা। ইহুদীদের মিত্র বনু যুরায়েক গোত্রের লাবীদ বিন আ'ছাম ) নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েদের মাধ্যমে এই জাদু করে। প্রথমে সে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসার কাজের ছেলের মাধ্যমে কয়েকটি চুলসহ রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যবহৃত চিরুনীটি সংগ্রহ করে। অতঃপর তার কন্যাদের দ্বারা উক্ত চুলে ১১টি জাদুর ফুঁক দিয়ে ১১টি গিরা দেয় ও তার মধ্যে ১১টি সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর চুল ও সুঁচ সমেত চিরুনীটি একটি খেজুরের শুকনা কাঁদির আবরণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 'যারওয়ান' '

) কুয়ার তলায় একটি বড় পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখে। মা আয়েশা (রাঃ(বলেন, উক্ত জাদুর প্রভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাঝে মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। যে কাজ করেননি, তা করেছেন বলে মনে করতেন। একরাতে স্বপ্নে দু'জন ফেরেশতা এসে নিজেদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁকে জাদুর বিষয়ে অবহিত করেন এবং সেটি কোথায় আছে বলে দেন। ফলে পরদিন আলী, যুবায়ের ও 'আম্মার বিন ইয়াসিরসহ একদল ছাহাবী গিয়ে উক্ত কূয়া সেঁচে পাথরের নীচ থেকে খেজুরের কাঁদির খোসাসহ চিরুনীটি বের করে আনেন। ঐ সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ দুই সূরার ১১টি আয়াতের প্রতিটি পাঠ শেষে এক একটি গিরা খুলতে থাকেন। অবশেষে সব গিরা খুলে গেলে তিনি স্বস্তি লাভ করেন।

লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে বলেন, ‘আল্লাহ আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক এটা আমি চাইনা।’

# প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের পর থেকে ৯ম ও ১০ম হিজরী সনকে আমরা 'প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন বছর' )( হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। মূলতঃ ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের পর চারিদিকে ইসলাম কবুলের ঢেউ ওঠে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান যেন মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কেননা তারা বলত, 'মুহাম্মাদ ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। কেননা যদি তিনি তাদের (অর্থাৎ কুরায়েশদের) উপরে জয়লাভ করেন, তাহ'লে তিনি সত্য নবী'। ১০০ অতঃপর যখন তিনি মক্কা জয় করলেন এবং কুরায়েশ নেতারা ইসলাম কবুল করলেন, এমনকি হোনায়েন যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হয়ে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ হ'তে দলে দলে প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করল এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'ল। ফলে দেখা গেল যে, মক্কা বিজয়ের মাত্র নয় মাসের মাথায় ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবুক অভিযানের সময় ৩০,০০০ ফৌজ জমা হয়ে গেল। তার এক বছর পর ১০ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ চব্বিশ হাযার বা ত্রিশ হাযার মুসলমান আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হ'লেন। ১০১ দু'দিন আগেও যারা লাত, মানাত, 'উয্যা, হোবলের নামে জয়ধ্বনি করত ও তাদের সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন নযর-নেয়ায নিয়ে তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের জন্য সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ত,

আজ তাদের লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হয়ে উঠলো।

প্রতিনিধি দল সমূহ

ইবনু সা'দ, দিমইয়াত্বী, ইবনু সাইয়িদিন নাস, মুগলাত্বাঈ, যয়নুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ জীবনীকারগণ ৬০-এর অধিক প্রতিনিধি দলের কথা বর্ণনা করেছেন। যুরক্বানী বলেন, উক্ত সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছবে না, যা প্রসিদ্ধ আছে'। তিনি ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে

জি'ইরানাতে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন শেষে আগত বনু হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে তালিকার প্রথমে এনেছেন। অতঃপর মোট ৩৫টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিয়েছেন। ১০২ আমরা সেখান থেকে ৩৪টি, যাদুল মা'আদ থেকে ২টি 'বনু তামীম' ও কা'ব বিন যুহায়ের' এবং ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ থেকে ১টি 'ইয়ামনের শাসকদের দূত' সহ মোট ৩৭টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিলাম। যার মধ্যে ইবনুল ক্বাইয়িম বর্ণিত ৩৫টি, মানছুরপুরী বর্ণিত ২৬টি এবং মুবারকপুরী বর্ণিত ১৬টি দলের উল্লেখ রয়েছে। দলগুলি হ'ল যথাক্রমে (১) বনু হাওয়াযেন (২) ছাক্বীফ (৩) বনু 'আমের বিন ছা'ছা'আহ (৪) আব্দুল কায়েস (৫) বনু হানীফা (৬) ত্বাঈ (৭) কিন্দা (৮) আশ'আরী (৯) বনু তামীম (১০) বনুল হারেছ (১১) হামদান (১২) মুযায়নাহ (১৩) দাউস (১৪) নাজরান (১৫) ফারওয়া বিন আমরের দূত (১৬) বনু সা'দ বিন বকর (১৭) তারেক বিন আব্দুল্লাহ প্রতিনিধি দল (১৮) তুজীব (১৯) বনু সা'দ হুযায়েম (২০) বনু ফাযারাহ (২১) বনু আসাদ (২২) বাহরা (২৩) উযরাহ (২৪) বালী (২৫) বনু মুরাহ (২৬) খাওলান (২৭) মুহারিব (২৮) ছুদা (২৯) গাসসান (৩০) সালামান (৩১) বনু 'আব্ক্স (৩২) গামেদ (৩৩) আযদ (৩৪) বনুল মুনতাফিকু (৩৫) কা'ব বিন যুহায়ের (৩৬) ইয়ামনের শাসকদের দূত এবং (৩৭) নাখঈ।

জীবনীকারগণ যতগুলি প্রতিনিধি দলের বিবরণ দিয়েছেন তার অনেকগুলি মুহাদ্দিছগণের নিকটে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তবে প্রায় সবগুলি মর্মগতভাবে প্রমাণিত। অনেকগুলি বর্ণনা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন বনু হাওয়াযেন, বনু তামীম, আব্দুল কায়েস, বনু হানীফাহ, নাজরান, ইয়ামনবাসী আশ'আরীগণ, দাউস, তাঈ, কিন্দা, মুযায়নাহ এবং বনু সা'দ বিন বকর প্রতিনিধি দল সমূহ। আমরা প্রত্যেকটি দল সম্পর্কে আলোচনা করব। কেননা প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়, যা অতীব যরূরী।

ইসলামী শিক্ষার বরকতে দুনিয়াপূজারী মানুষগুলি হয়ে উঠলো আখেরাতের পূজারী। আখেরাতের বিনিময়ে তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করল। যে কাজে আখেরাতে কল্যাণ নেই, সে কাজ পরিত্যক্ত হ'ল। সম্পদের প্রাচুর্য তাদেরকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি।

বরং আখেরাতের স্বার্থে দ্বীনের কাজে অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতেই তারা অধিক আনন্দ বোধ করলেন। নিজের সবচেয়ে পসন্দের বস্তুটি দান করে দিয়ে তাঁরা মানসিক তৃপ্তি পেতেন। দিনের বেলা দাওয়াত ও জিহাদে কিংবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যস্ততায় সময় কাটলেও রাতটি ছিল স্রেফ আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিবেদিত। যে মানুষটি দু'দিন আগেও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মূর্তির শরণাপন্ন হ'ত, মহামূল্য নযর-নেয়ায নিয়ে প্রাণহীন মূর্তির সন্তুষ্টিতে রত ছিল এবং নিজেদের কপোল কল্পিত বিভিন্ন অসীলার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করত, সেই মানুষটিই এখন সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে সরাসরি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করছে। দেহমন ঢেলে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় রাত্রি জাগরণে ও ইবাদতে লিপ্ত হচ্ছে। দু'দিন আগেও যারা পথে-ঘাটে রাহাযানি করত, নারীর ইযযত লুট করত, তারাই আজ অপরের জান-মাল ও ইযযত রক্ষায় হাসিমুখে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মানুষ এখন একাকী রাস্তায় নির্ভয়ে চলে। ইরাকের হীরা নগরী থেকে একজন পর্দানশীন গৃহবধু একাকী মক্কায় এসে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করে চলে যান নিরাপদে নির্বিঘ্নে। বিপদগ্রস্ত নারীকে শক্তিশালী একজন পরপুরুষ মায়ের মর্যাদা দিয়ে তার বিপদে সাহায্য করছে স্রেফ পরকালীন স্বার্থে।

দু'দিন আগেও যারা সূদ ব্যতীত কাউকে ঋণ দিত না, এখন তারাই সূদকে নিকৃষ্টতম হারাম গণ্য করছে এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে 'কর্যে হাসানাহ' দিচ্ছে। যেখানে ছিল গাছতলা ও পাঁচতলার আকাশসম অর্থনৈতিক বৈষম্য, সেখানে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যাকাত নেওয়ার মত হকদার খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'দিন আগেও যে সমাজে ছিল মদ্যপান, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও যৌনতার ছড়াছড়ি, আজ সেই সমাজে চালু হয়েছে পর্দানশীন, মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচার। যে সমাজে ছিল ধর্মের নামে অসংখ্য শিরক-বিদ'আত ও অর্থহীন লোকাচার। ছিল গোত্রে গোত্রে বিভক্তি ও হানাহানি। আজ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে পরস্পরে আদর্শিক মহব্বত ও ভালোবাসার অটুট বন্ধনের এক জান্নাতী আবহ। সবকিছুই সুন্নাহ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত। আগে যেখানে ছিল মানুষের মধ্যে প্রভু ও দাসের সম্পর্ক, ছোট-বড় ও সাদা-কালোর ভেদাভেদ। আজ সেখানে এক আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। অর্থনৈতিক বৈষম্য, বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্যের অহংকারের বদলে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হ'ল আল্লাহভীরুতার মাপকাঠিতে। বলা হ'ল, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর আদম

ছিলেন মাটির তৈরী। তাই কারু কোন অহংকার নেই। বলা হ'ল সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই তাঁর প্রেরিত বিধান সকলের জন্য সমান। আগে যেখানে দুনিয়াবী ভোগবিলাস ছিল মূল লক্ষ্য। আজ সেখানে দুনিয়া তুচ্ছ, আখেরাতই মুখ্য।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই আমূল পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজনীতি সবকিছুতেই সূচিত হয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। যা পুরা মানব সভ্যতায় আনে এক বৈপ্লবিক অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি অভাবিত উন্নতিতে পরবর্তীকালে মুসলমানদের যে অনন্য অবদানের স্বাক্ষর বিশ্ব ও বিজ্ঞানের অবলোকন করেছিল, তার মূলে ছিল ইসলামের তাওহীদী চেতনার অম্লান ছাপ। তার সর্বজয়ী আবেদনের বাস্তব প্রতিফলন। তাওহীদ ও সুন্নাহর সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে পারলে মুসলমান আবার তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, '১ তোমরা হীনবল হইয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও' (আলে ইমরান ৩/১৩৯)।

## রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ

নবগঠিত মাদানী রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত মযবুত করার জন্য এবং ফরয যাকাত ও অন্যান্য ছাদাক্বা সমূহ সুশৃংখলভাবে আদায় ও বণ্টনের জন্য আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন। ৯ম হিজরী সনের মুহাররম মাস থেকে এই সকল নিয়োগ কার্যকর হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের অধীন ১৬টি অঞ্চল ও গোত্রের জন্য ১৬ জন রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ১৬৪ উল্লেখ্য যে, ২য় হিজরীর রামাযান মাসে ছিয়াম ফরয হয় এবং শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয়। নিম্নে যাকাত আদায়কারীসহ রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব অঞ্চল সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হ'ল।-

**নং কর্মকর্তা অঞ্চল/গোত্র**

**১ উয়ায়না বিন হিসন – বনু তামীম**

**২ বুরাইদা বিন হুছাইব— আল-আসলামী আসলাম ও গেফার**

**৩ 'আব্বাদ বিন বিশর আশহালী—-- সুলায়েম ও মুযায়না**

**৪ রাফে' বিন মাকীছ (رَافِعُ بْنُ مَكِيث)-- জুহায়না**

**৫ আমর ইবনুল 'আছ – বনু ফাযারাহ**

**৬ যাহহাক বিন সুফিয়ান— বনু কেলাব**

**৭ বুসর বিন সুফিয়ান আল-কা'বী— বনু কা'ব**

**৮ ইবনুল লুতবিয়্যাহ আল-আযদী —-বনু যুবইয়ান**

**৯ মুহাজির বিন আবু উমাইয়া—- ছান'আ শহর**

**১০ যিয়াদ বিন লাবীদ –হাযরামাউত**

**১১ 'আদী বিন হাতেম– বনু ত্বাঈ ও বনু আসাদ**

**১২ মালেক বিন নুওয়াইরাহ –বনু হানযালা**

**১৩ যিবরিক্বান বিন বদর —বনু সা'দের একটি অংশে**

**১৪ ক্বায়েস বিন 'আছেম —বনু সা'দের আরেকটি অংশে**

**১৫ 'আলা ইবনুল হাযরামী —বাহরায়েন**

**১৬ আলী ইবনু আবী ত্বালেব —নাজরান (ছাদাক্বা ও জিযিয়া উভয়টি আদায়ের জন্য)**

এ সময় কোন কোন গোত্র জিযিয়া ও ছাদাক্বা দিতে অস্বীকার করে। এমনকি অন্যকে দিতে বাধা প্রদান করে। এমনি একটি গোত্র ছিল বনু তামীম। ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে উক্ত গোত্রের জন্য দায়িত্বশীল রাজস্ব কর্মকর্তা উয়ায়না বিন হিছন মুহাজির ও আনছারদের বাইরে ৫০ জনের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে এদের উপরে আকস্মিক হামলা চালালে সবাই পালিয়ে যায়। তাদের ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০ জন শিশু বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয় এবং রামলা বিনতুল হারেছ-এর গৃহে তাদের রাখা

হয়। পরদিন বনু তামীমের আকুরা বিন হাবেস সহ কয়েকজন নেতা বন্দীমুক্তির জন্য মদীনায় আসেন। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উত্তম উপঢৌকনাদি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের বন্দীদের ফেরৎ দেন'। (বিস্ত ারিত দ্রঃ প্রতিনিধি দল ক্রমিক ৯)।

জনৈক রাজস্ব কর্মকর্তা ইবনুল লুৎবিয়াহ )( ছাদাক্বা আদায় করতে গিয়ে নিজের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আবু হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দ গোত্রের ইবনুল লুৎবিয়াহকে ছাদাক্বা আদায়ের দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ দান করেন। অতঃপর যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন বলেন,

'এটি তোমাদের জন্য এবং এটি আমাকে হাদিয়া প্রদান করা হয়েছে'। একথা শুনতে। পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে যান এবং হামদ ও ছানার পরে বলেন, হয়েছে? যাকে আমরা নিয়োগ দিলাম। অতঃপর সে আমাদের কাছে এল আর বলল, এটি তোমাদের এবং এটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে'। ল কেন সে তার পিতা বা মাতার গৃহে বসে থাকেনা?

অতঃপর সে দেখুক তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমাদের যে কেউ আদায়কৃত মাল থেকে যতটুকু গ্রহণ করবে, ততটুকু কিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে নিয়ে উঠতে হবে। যদি তা উট হয়, গরু হয় বা ছাগল হয়'। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত উঁচু করলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁর দুই বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?' (বুখারী হা/২৫৯৭, ৬৬৩৬; মুসলিম হা/১৮৩২)

# বিদায় হজ্জ

মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আরবের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম পৌঁছে গেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝলেন আর বেশিদিন পৃথিবীতে তাঁর থাকা হবে না। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরিতে) হজ করার ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশ্যে উক্ত সালের যিলকদ মাসে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ করতে গেলেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে রাসুল (স.)-এর সহধর্মিণীগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে সকলে ইহরাম (হজের পোশাক) বেঁধে বাইতুল্লাহর উদ্দেশে রওনা হন। জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশ্ব মানবতার সকল কিছুর দিকনির্দেশনা ছিল। আরাফাতের ময়দানের পার্শ্বে 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন-

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কিনা জানি না।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিক পবিত্র।

৩ মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।

৪. হে বিশ্বাসীগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।

৫•সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।

৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করবে না।

মনে রেখ! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ থেকে বংশগত শেষ্ঠত বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি ও সৎকর্ম। সে ব্যক্তিই সবচেয়ে সেরা, যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৮ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না; পূর্বের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।

দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

১০. জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তার রাসুলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এগুলো যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

১১. আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।

১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ এলো, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপরই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،

অর্থ: আজ আমি তোমাদের দ্বীন (জীবনবিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)।

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব থাকল। অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আল-বিদা' (বিদায়)। একটা অজানা বিয়োগ-ব্যথা উপস্থিত সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

## অসুখের সূচনা

হজ্জ থেকে ফিরে যিলহজ্জের বাকী দিনগুলিসহ ১১ হিজরীর মুহাররম ও ছফর পুরা দু'মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন।

বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার বিখ্যাত আয়াতটি (মায়েদাহ ৫/৩) নাযিল হয়। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বের ঘটনা। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে মিনায় 'সূরা নছর' নাযিল হয়। মৃত্যুর ৫০দিন পূর্বে নাযিল হয় কালালাহর বিখ্যাত আয়াতটি (নিসা ৪/১৭৬)। অতঃপর মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা তওবার সর্বশেষ দু'টি আয়াত-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট যার উপরে কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু'। 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি' (তওবা ৯/১২৮-১২৯)। অতঃপর মৃত্যুর ২১ দিন মতান্তরে ৭ দিন পূর্বে নাযিল হয় কুরআনের সর্বশেষ আয়াতটি-

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْن- َ

'আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা পুনরায় ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' (বাক্বারাহ ২/২৮১; কুরতুবী, তাফসীর সূরা নছর)।

বিদায়ের পূর্বলক্ষণ সমূহ ) :

মূলতঃ সূরা নছর নাযিলের পরেই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বুঝতে পারেন যে, সত্বর তাঁকে আখেরাতে পাড়ি দিতে হবে। তখন থেকেই যেন তার অদৃশ্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। যেমন-

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, সূরা নছর নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন কোন ছালাত আদায় করেননি, যেখানে রুকু ও সিজদায় নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন না।
মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা তোমার জন্য সকল প্রশংসা হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

ইমাম কুরতুবী বলেন ক্ষমা প্রার্থনা হল দাসত্ব প্রকাশ করা যা আল্লাহর নিকটে পেশ করা ওয়াজিব এটি ক্ষমার জন্য নয় বরং অধিক দাসত্ব প্রকাশ্যের জন্য

(২) অন্যান্য বছর রামাযানের শেষে দশদিন ই'তিকাফে থাকলেও ১০ম হিজরীর রামাযানে তিনি ২০ দিন ই'তিকাফে থাকেন।

(৩) অন্যান্য বছর জিব্রীল (আঃ) রামাযানে একবার সমস্ত কুরআন পেশ করলেও এ বছর সেটা দু'বার করেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে বলেন, আমার মৃত্যু খুব নিকটে মনে হচ্ছে'।

(৪) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না এ বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হ'তে পারব কি-না' (নাসাঈ হা/৩০৬২)।

(৫) পরদিন মিনায় কুরবানীর দিনের ভাষণে জামরা আক্বাবায়ে কুবরায় তিনি বলেন, 'আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জ ও কুরবানীর )( নিয়ম-কানূনগুলি শিখে নাও। কারণ এ বছরের পর হয়তবা আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না।

(৬) মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ওহোদ প্রান্তে 'শোহাদা কবরস্থানে' গমন করেন এবং তাদের জন্য এমনভাবে দো'আ করেন যেন তিনি জীবিত ও মৃত সকলের নিকট থেকে চির বিদায় গ্রহণ করছেন। রাবী ওকুবা বিন 'আমের (রাঃ) বলেন, আট বছর পরে রাসূল (ছাঃ) এই যিয়ারত করেন মৃতদের নিকট থেকে (

(৭) শোহাদা কবরস্থান যিয়ারত শেষে মদীনায় ফিরে তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وزاد بعضهم : فَتَقْتَتِلُوا فَتُهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم

তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্য দানকারী হব। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে হাউয কাওছারে। আমি এখুনি আমার 'হাউষ কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'।

অসুখের সূচনা :

ইবনু কাছীর বলেন, ছফর মাসের দু'একদিন বাকী থাকতে অথবা রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিন অসুখের সূচনা হয় (আল-বিদায়াহ ৫/২২৪)। এদিন মধ্যরাতে রাসূল

)ছাঃ) স্বীয় গোলাম আবু মুওয়াইহিবাহ )(-কে সাথে নিয়ে বাক্বী' গোরস্থানে গমন করেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রচণ্ড মাথাব্যথার মাধ্যমে অসুখের সূচনা হয়। যা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল' (আহমাদ হা/১৬০৪০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন যেদিন তাঁর অসুখ শুরু হয়। তখন আমি বললাম, হায় মাথাব্যথা!... তিনি বললেন, আমারও প্রচণ্ড মাথাব্যথা। অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি তোমার পিতা ও ভাইকে আমার নিকটে ডেকে আনো।

যাতে আমি আবুবকরের জন্য একটি কাগজ লিখে দিতে পারি। কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি বলবে বা কোন উচ্চাভিলাষী আকাংখা করবে যে, আমিই যোগ্য। অথচ আল্লাহ ও মুমিনগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে থাকা অবস্থাতেই মাথাব্যথা শুরু হয় এবং একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) অসুখের শুরুর দিনেই আবুবকর (রাঃ)-এর নামে খিলাফত লিখে দিতে চেয়েছিলেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাঁর দেহের উপর হাত রাখলাম। তখন তাঁর লেপের উপরেও তাপ অনুভূত হচ্ছিল। শরীর এত গরম ছিল যে, হাত পুড়ে যাচ্ছিল। এতে আমি বিস্ময়বোধ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

এভাবে আমাদের কষ্ট দ্বিগুণ হয় এবং আমাদের পুরস্কারও দ্বিগুণ হয়। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা? তিনি বললেন, নবীগণ। আমি বললাম, তারপর কারা? তিনি বললেন, নেককার ব্যক্তিগণ। এমনকি তাদের কেউ দাবিদ্যের কষাঘাতে এমনভাবে জর্জরিত হবে যে, পোষাক হিসাবে মাথার 'আবা' (না) ছাড়া কিছুই পাবে না। তাদের কেউ বিপদে পড়লে এমন খুশী হবে, যেমন তোমাদের কেউ প্রাচুর্য পেলে খুশী হয়ে থাক'।

তাঁর মোট অসুখের সময়কাল ছিল ১৩ অথবা ১৪ দিন। যার মধ্যে অধিকাংশ দিন তিনি মসজিদে এসে জামা'আতে ইমামতি করেন। শেষের দিকে বৃহস্পতিবার এশা থেকে সোমবার ফজর পর্যন্ত ১৭ ওয়াক্ত ছালাতে আবুবকর (রাঃ) ইমামতি করেন।

## সর্বশেষ ইমামতি

মৃত্যুর চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার মাগরিবের ছালাতের ইমামতিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ ইমামতি। অসুখ সত্ত্বেও তিনি এযাবত প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে ইমামতি করেছেন। সর্বশেষ এই ইমামতিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথম দু'রাক'আতে সূরা মুরসালাত পাঠ করেন'। যার সর্বশেষ আয়াত 'এর পরে কোন বাণীর উপরে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে'? (মুরসালাত ৭৭/৫০)। অর্থাৎ কুরআনের পরে আর কোন কালামের উপরে তোমরা ঈমান আনবে?

এর দ্বারা যেন তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, আল্লাহ পাকের আহ্বানের সাথে সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আমার জীবনের সর্বশেষ আহ্বান হ'ল, সর্বাবস্থায় তোমরা কুরআনের বিধান মেনে চলবে। কোন অবস্থাতেই কুরআন ছেড়ে অন্য কিছু গ্রহণ করবে না।

:

এশার ছালাতের জন্য আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তিনবার ওযূ করেন ও তিনবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আবুবকরকে ইমামতি করার নির্দেশ পাঠান। এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আবুবকর (রাঃ) একটানা ১৭ ওয়াক্ত ছালাতের ইমামতি করেন। লোকেরা খারাপ ধারণা করবে মনে করে আয়েশা (রাঃ) তিন থেকে চারবার তার পিতার ইমামতির ব্যাপারে আপত্তি তুলে অন্যকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উক্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমরা ইউসুফের সহচরীদের মত হয়ে গেছ। আবুবকরকে বলে দাও যেন সে ছালাতে ইমামতি করে'। অর্থাৎ যুলায়খা ও তার সহচরী মহিলারা যেভাবে ইউসুফকে অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, তোমরাও তেমনি আমাকে আবুবকরকে বাদ দিয়ে অন্যকে ইমামতি করার মত অন্যায় নির্দেশ দানে প্ররোচিত করতে চাও? এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ খেলাফতের জন্য আবুবকরের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সেটা বুঝতে পেরেই সম্ভবতঃ তাঁর নাম খলীফা হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন এবং সাথে সাথেই সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়। তাছাড়া তাঁর তুলনীয় ব্যক্তিত্ব উম্মতের মধ্যে তখনও কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও হবে না।

মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান প্রেরণ:

শনিবারে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কিছুটা হালকা বোধ করেন। এমতাবস্থায় তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। তখন আবুবকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে যোহরের জামা'আত শুরু হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন টের পেয়ে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসার উদ্যোগ নিতেই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে আবুবকর (রাঃ)-এর বামপাশে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ইকুতেদা করতে থাকেন এবং লোকদেরকে

তাকবীর শুনাতে থাকেন'। বস্তুতঃ এটাই ছিল ছালাতে মুকাব্বির হওয়ার প্রথম ঘটনা। আর আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম 'মুকাব্বির'।

তাছাড়া এদিন তিনি উসামাহ বিন যায়েদ-এর নেতৃত্বে শাম অঞ্চলে সর্বশেষ সেনাদল প্রেরণ করেন ।

## জীবনের শেষ দিন

সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্বদিন রবিবার তিনি স্ত্রী আয়েশাকে বলেন, দীনারগুলি কি বিতরণ করেছ? তিনি বললেন, আপনার রোগ যন্ত্রণায় ব্যস্ত থাকার কারণে বিতরণের সময় পাইনি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওগুলি আমার কাছে নিয়ে এস। ঐ সময় ঘরে ৫ থেকে ৯টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আয়েশা (রাঃ) সেগুলি এনে তাঁর হাতে দিলেন। তখন তিনি বললেন, এগুলি এখুনি বিতরণ করে দাও। কেননা কোন নবীর জন্য এটি মর্যাদাকর নয় যে, এইরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তুগুলি নিয়ে তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবেন'।১০৬৯ অথচ ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইহুদীর নিকটে ৩০ ছা' (৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

সোমবার ফজরের জামা'আত চলা অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঘরের পর্দা উঠিয়ে একদৃষ্টে মসজিদে জামা'আতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে তাঁর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং ঠোটে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতে আসার আগ্রহ বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসতে চান। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দেন এবং দরজার পর্দা ঝুলিয়ে দেন। রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর ভাষায় 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা ছিল যেন 'কুরআনের পাতা' )(। অতঃপর এদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন'।

কুরআনের বাস্তব রূপকার, মৃত্যুপথযাত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর শুচিশুদ্ধ আলোকময় চেহারা যেন পরম পবিত্র সত্যসন্ধ কুরআনের কনকোজ্জ্বল পৃষ্ঠার ন্যায় দীপ্ত ও জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। আনাস (রাঃ)-এর এই অপূর্ব তুলনা সত্যি কতই না সুন্দর ও কতই না

মনোহর! ছালাতের পাগল রাসূল (ছাঃ)-এর ভাগ্যে যোহরের ওয়াক্ত আসার সুযোগ আর হয়নি।...

এরপর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমাকে কাছে ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি কাঁদতে থাকেন। পরে তাকে আবার ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি হেসে ওঠেন। প্রথমবারে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন যে, এই অসুখেই আমার মৃত্যু ঘটবে। তাতে তিনি কাঁদেন। দ্বিতীয়বারে তিনি বলেন যে, পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হবে)। তাতে তিনি হাসেন। এই সময় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে 'জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী' হবার সুসংবাদ দান করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর রোগ-যন্ত্রণার কষ্ট দেখে ফাতেমা (রাঃ) বলে ওঠেন, 'হায় কষ্ট'! রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট নেই'।

অতঃপর তিনি হাসান ও হোসায়েনকে ডাকেন। তাদেরকে আদর করে চুমু দেন ও তাদেরকে সদুপদেশ দেন। উভয়ের বয়স তখন যথাক্রমে ৮ ও ৭ বছর। এরপর স্ত্রীগণকে ডাকেন ও তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দেন। এ সময় তাঁর রোগ-যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আয়েশা। খায়বরে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, সে বিষের প্রভাবে আমার শিরা-উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে'। তিনি গিলেননি, ফেলে দিয়েছিলেন। তাতেই যে সামান্য বিষক্রিয়া হয়, সেটিই মৃত্যুকালে তাঁকে কঠিনভাবে কষ্ট দেয়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, পুরানো কোন অসুখ যা সুপ্ত থাকে, তা বার্ধক্যে বা মৃত্যুকালে মাথা চাড়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয় শেষে ইহূদী বনু নাযীর গোত্রের নেতা সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাঁকে দাওয়াত দিয়ে বিষমিশ্রিত বকরীর ভুনা রান খেতে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই গোশত মুখে দিয়ে চিবানোর পর না গিলে ফেলে দেন )( এবং বলেন, এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে এতে বিষ মিশানো আছে'। অতঃপর তিনি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ছালাত ছালাত এবং তোমাদের দাস-দাসী' অর্থাৎ ছালাত ও স্ত্রীজাতির বিষয়ে তোমরা সর্বাধিক খেয়াল

রেখো'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথাটি তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন'। আনাস (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত'।

এরপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হ'ল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশার বুকে ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই আব্দুর রহমান (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হন। তার হাতে কাঁচা মিসওয়াক দেখে সেদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি গেল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁর অনুমতি নিয়ে মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তখন তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন ও পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে (কুলি সহ) মুখ ধৌত করলেন। এসময় তিনি বলতে থাকেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা সমূহ'। এমন সময় তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত কিংবা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলতে থাকলেন,

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى-

'(হে আল্লাহ!) নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককার ব্যক্তিগণ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের সাথী করে নাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর এবং আমাকে আমার সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর। হে আল্লাহ! আমার সর্বোচ্চ বন্ধু!' আয়েশা (রাঃ) বলেন, শেষের কথাটি তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল, দৃষ্টি নিথর হয়ে গেল'। তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত হ'লেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার উপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যে হেলান দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে পার্থিব জীবনের শেষ দিন ও পরকালীন জীবনের প্রথম দিন আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর
মুখের লালা মিলিয়ে দিয়েছেন। আর আমার ঘরেই তাঁর দাফন হয়েছে' আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর মাথা ছিল

আমার রানের উপর, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে এল। তখন তিনি ছাদের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না। বুঝলাম, যে কথা তিনি সুস্থ অবস্থায় বলতেন, সেটাই ঠিক হ'ল। তা এই যে কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না যতক্ষণ না জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয় অতঃপর তাকে একটি আর দেওয়া হয় দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অথবা মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাওয়ার।

আমি বুঝলাম যে, তিনি আখেরাতকেই পসন্দ করলেন। অতঃপর আমি তাঁর মাথা বালিশে রাখি এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথে কাঁদতে কাঁদতে উঠে আসি' (ইবনু হিশাম ২/৬৫৫)। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন (আমরা সবাই আল্লাহ্ জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী; (বাক্বারাহ ২/১৫৬)।

উপরোক্ত দুই বর্ণনার সমন্বয় এটাই হ'তে পারে যে, বুকের উপরে মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে স্বীয় রানের উপরে শুইয়ে দেন এবং তখনই রাসূল (ছাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দিনটি ছিল সোমবার (বুখারী হা/১৩৮৭) সূর্য অধিক গরম হওয়ার সময় ) অর্থাৎ ১০/১১ টার সময়। এ দিন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৬৩ বছর (বুখারী হা/৩৫৩৬) চার দিন (রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/২৫১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুতে শোকাতুর কন্যা ফাতেমা বলে ওঠেন,

يَا أَبْنَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَنَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَنَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ، عَلَيْهَا السَّلامُ، يَا أَنَسُ ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التراب - رواه البخاري

'হায় আব্বা! যিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আব্বা! জান্নাতুল ফেরদৌসে যার ঠিকানা। হায় আব্বা! জিব্রীলকে আমরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি'। অতঃপর দাফন

হয়ে গেলে তিনি বলেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মাটি ফেলে তোমাদের অন্তর কি খুশী হয়েছে'?

সাধারণভাবে ছাহাবীগণের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর

বিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারছিলেন না। অনেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে জঙ্গলে চলে যান। ওমর ফারুক (রাঃ) হতবুদ্ধি হয়ে বলতে থাকেন, কিছু মুনাফিক লোক ধারণা করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে। অথচ নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। বরং স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে গমন করেছেন। যেমন মূসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন' (ইবনু হিশাম ২/৬৫৫)। তিনি বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি ঐসব লোকদের হাত-

পা কেটে দিবেন' (বুখারী হা/৩৬৬৭)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মরেননি এবং মরবেনও না, যতক্ষণ না তিনি মুনাফিকদের বহু লোকের হাত-পা কেটে দেন' (ইবনু মাজাহ হা/১৬২৭, হাদীছ ছহীহ)।

আবুবকর (রাঃ)-এর ধৈর্যশীল ভূমিকা ) :

শোকাহত ছাহাবায়ে কেরামের দিশাহারা অবস্থার মধ্যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের জীবন্ত প্রতীক হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে শহরের উঁচু সুনহ )ُالسُّنح( এলাকায় অবস্থিত স্বীয় বাসগৃহ থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত আগমন করেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর কাউকে কিছু না বলে সোজা কন্যা আয়েশার গৃহে গমন করেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ একটি জরিদার ইয়ামনী চাদর )ٍبُرْدُ حِبَرَة( দ্বারা আবৃত ছিল। তিনি গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার উপর থেকে চাদর সরিয়ে চুম্বন করলেন ও কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, بابي أنت وَأُمِّي، وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ ذُقْتَهَا -

'আপনার উপরে আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন! আল্লাহ আপনার উপরে দু'টি মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না। অতঃপর যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তার স্বাদ আপনি আস্বাদন করেছেন' (বুখারী হা/১২৪১)। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

জন্য উৎস্বর্গিত হৌন! আপনার জীবন ও মরণ সুখময় হৌক! যার হাতে আমার জীবন

তাঁর কসম করে বলছি, কখনোই আল্লাহ আপনাকে দু'টি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন

না' (বুখারী হা/৩৬৬৭)। এরপর তিনি মুখ ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এমন

সময় ওমর (রাঃ) সম্ভবতঃ স্বীয় বক্তব্যের পক্ষে লোকদের কিছু বলছিলেন। আবুবকর

)রাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে কসমকারী! থামো'।

কিন্তু তিনি থামলেন না (বুখারী হা/৩৬৬৭)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ৮। 'তুমি বস। কিন্তু তিনি বসলেন না' (বুখারী হা/১২৪২)। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। লোকেরা সব ওমরকে ছেড়ে তাঁর সাথে সাথে মসজিদে এলো। তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণের শুরুতে হামদ ও ছানার পর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলেন। অতঃপর গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ الله حَى لَا يَمُوْتُ ، قَالَ الله تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِي

'হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের পূজা করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব তিনি মরেন না। তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়ে গেছেন। এক্ষণে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পিছন পানে ফিরে যাবে? যে

ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। সত্বর আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন' (আলে ইমরান ৩/১৪৪)। অতঃপর লোকেরা উক্ত আয়াতটি বারবার পাঠ করতে থাকে' (বুখারী হা/১২৪২)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর উক্ত ভাষণ শোনার পর সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। সবার মনে হ'ল যেন আবুবকরের মুখে শোনার আগে উক্ত আয়াতটি তারা জানতেনই না। অতঃপর যেই-ই শোনেন, সেই-ই আয়াতটি পড়তে থাকেন'। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, ওমর বললেন, আল্লাহর কসম! আবুবকরের মুখে উক্ত আয়াত শুনে আমি আমার দু'পা স্থির রাখতে পারিনি। অবশেষে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি নিশ্চিত হ'লাম যে, রাসূল (ছাঃ) মারা গেছেন (বুখারী হা/৪৪৫৪)। ওমর (রাঃ) আবুবকরের ভাষণ শুনে বসে পড়েন এবং বলেন, 'আমার মনে হচ্ছিল যেন আয়াতগুলি আমি এদিন ব্যতীত ইতিপূর্বে কখনো পাঠ করিনি'। আমি প্রথম আবুবকরের মুখে এটি শুনলাম এবং নিশ্চিত হ'লাম যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন'। আনাস (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطْ كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضْوَا مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً كَانَ أَقْبَحَ وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেদিন আমাদের নিকটে আগমন করেছিলেন, সেদিনের চাইতে সুন্দর ও উজ্জ্বলতম দিন আমি কখনও দেখিনি। পক্ষান্তরে যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, সেদিনের চাইতে মন্দ ও অন্ধকারময় দিন আমি আর দেখিনি'।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ওফাতের পর দীনার-দিরহাম, বকরী-উট কিছুই রেখে যাননি। তিনি কোন কিছুর অছিয়তও করে যাননি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (আমার মৃত্যুর পর) আমার ওয়ারিছগণ কোন দীনার ভাগ-বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাব (অর্থাৎ বনু নাযীরের ফাই এবং খায়বরের ফাদাক খেজুর বাগান) স্ত্রীদের খোরপোষ এবং আমার 'আমেল (কর্মচারী)-দের ব্যয় নির্বাহের পর তা সবই ছাদাক্বা হবে। উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ-এর ভাই 'আমর ইবনুল হারেছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে কোন দীনার-

দিরহাম, দাস-দাসী বা অন্য কিছুই ছেড়ে যাননি। কেবল তাঁর সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও (ফাদাকের) জমিটুকু ব্যতীত। যা তিনি ছাদাক্বা করে যান। এর অর্থ হ'ল সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্তগুলি ছাদাক্বা হবে (ফাৎহুল বারী, ঐ)। আবুবকর ছিদ্দীকু (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, - আমরা নবীগণ কোন ওয়ারিছ রেখে যাই না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই (উম্মতের জন্য) ছাদাক্বা হয়ে যায়'। তাঁর মৃত্যুর পর ফাতেমা (রাঃ) ফাদাক-এর উত্তরাধিকার দাবী করলে অত্র হাদীছ শোনার পর তা প্রত্যাহার করে নেন। যদিও শী'আরা এজন্য আবুবকর (রাঃ)-কে দায়ী করে থাকে। অথচ আলী (রাঃ) খলীফা হওয়ার পরেও তিনি উক্ত দাবী করেননি।

গোসল ও কাফন:

সোমবার দিনভর রাসূল (ছাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত নেতা বা 'খলীফা' নির্বাচনে ব্যয় হয়ে যায়। ছাক্বীফায়ে বনী সা'এদায় সর্বসম্মতভাবে হযরত আবুবকর ছিদ্দীকু (রাঃ) উম্মতের খলীফা নির্বাচিত হন। পরদিন মঙ্গলবার সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গোসল দেওয়া হয়। এই সময় পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক একটি জরিদার ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত রাখা হয় এবং তাঁর কক্ষ ভিতর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ বন্ধ করে রাখেন।

গোসলের কাজে অংশ নেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র ফযল ও কুছাম (৩) এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস শুকুরান (ক্রি), উসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খাওলী এবং হযরত আলী (রাঃ) সহ মোট ৭জন। আওস ছিলেন খাযরাজ গোত্রের একজন বদরী ছাহাবী। যিনি হযরত আলীকে আল্লাহর কসম দিয়ে গোসলের কাজে শরীক হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন' (ইবনু হিশাম ২/৬৬২)। আওস বিন খাওলী রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক নিজের বুকের উপরে ঠেস দিয়ে রাখেন। হযরত আব্বাস ও তাঁর পুত্রদ্বয় তাঁর দেহের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন। উসামা ও শুকুরান পানি ঢালেন এবং হযরত আলী রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক ধৌত করেন। এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর পরিহিত পোষাক খোলা হয়নি।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি ইয়ামনী সাদা চাদর দিয়ে কাফন পরানো হয়। এগুলির মধ্যে ক্বামীছ ও পাগড়ী ছিল না। ১০৯৫ তাঁর অন্য বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা তাঁকে গোসল দেওয়ার সময় মতভেদ করল যে, অন্যান্য মাইয়েতের দেহ থেকে যেভাবে কাপড় খুলে নেওয়া হয়, সেভাবে করা হবে কি-না? তখন আল্লাহ তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দেন। যাতে তারা সবাই ঢুলতে থাকে। এরি মধ্যে হঠাৎ একজন গৃহ কোণ থেকে বলে উঠে, 'তোমরা নবীকে গোসল দাও তাঁর দেহের কাপড় সহ। তখন সকলে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে গোসল দিল। এমতাবস্থায় তাঁর দেহে ক্বামীছ (জামা) ছিল। ক্বামীছের উপর দিয়েই তারা পানি ঢালে এবং ক্বামীছের উপর দিয়েই তাঁর দেহ কচলায়'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যদি আমি আগে জানতাম যা পরে জানলাম, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে কেউই গোসল দিতে পারত না, তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত'। এক্ষণে তাঁকে পরিহিত পোষাকসহ গোসল ও কাফন করা হয় বিধায় প্রথম বর্ণনায় কাফনের কাপড়ের মধ্যে ক্বামীছ বা জামা ছিল না বলার সেটিও একটি কারণ হ'তে পারে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এসেছে। কিন্তু তিনটি কাপড়ের ব্যাখ্যা এসেছে আহমাদ (হা/১৯৪২), আবুদাউদ (হা/৩১৫৩), তিরমিযী (হা/৯৯৭) সহ অন্যান্য হাদীছে ক্বামীছ, ইযার ও লিফাফাহ তথা জামা, লুঙ্গী ও বড় চাদর হিসাবে। যদিও ঐসব হাদীছগুলির সনদ দুর্বলতা মুক্ত নয়। তবে জামা সহ তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই'।

দাফন )( :

দাফন কোথায় হবে এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আবুবকর ছিদ্দীকু (রাঃ) এসে 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন'। এ হাদীছ শোনার পর সকল মতভেদের অবসান

হয়। ছাহাবী আবু তালহা রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা উঠিয়ে নেন। অতঃপর সেখানেই 'লাহাদ' )( অর্থাৎ পাশখুলী কবর খনন করা হয়' (ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৭)। আবু জ্বালহা উক্ত

কবর খনন করেন (ইবনু হিশাম ২/৬৬৩)। অতঃপর কবরে নামেন হযরত আলী, ফযল ও

কুছাম বিন আব্বাস, শুকুরান ও আউস বিন খাওলী' (ইবনু হিশাম ২/৬৬৪)।

জানাযা )( :

ঘরের মধ্যে খননকৃত কবরের পাশেই লাশ রাখা হয়। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা পড়েন। জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনছারগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা পড়েন। জানাযার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া মঙ্গলবার সারা দিন ও রাত পর্যন্ত জারী থাকে। ফলে বুধবারের মধ্যরাতে দাফনকার্য সম্পন্ন হয় (ইবনু হিশাম ২/৬৬৪)। মানছুরপুরী বলেন, ইসলামী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সন্ধ্যার পরেই দিন শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী দিন শুরু হয়। সেকারণ মঙ্গলবার ও বুধবারের মতভেদ দূর করার জন্য আমরা ঘণ্টার আশ্রয় নিয়েছি। সে হিসাবে মৃত্যুর প্রায় ৩২ ঘণ্টা পরে রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। এভাবেই ৬৩ বছরের পবিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।

ধন্যবাদান্তে

উস্তাজদের দারস সমুহ
ও
বই - আর রাহীকুল মাকতুমে ও সীরাতুন্নাবি (সা:)